৫১-৫২ দুই খণ্ড একত্রে
নীল দ্বীপের
রাণী
রোমেনা আফাজ
Belal

এই সিরিজের পরবর্তী বই
জংলী মেয়ে

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন
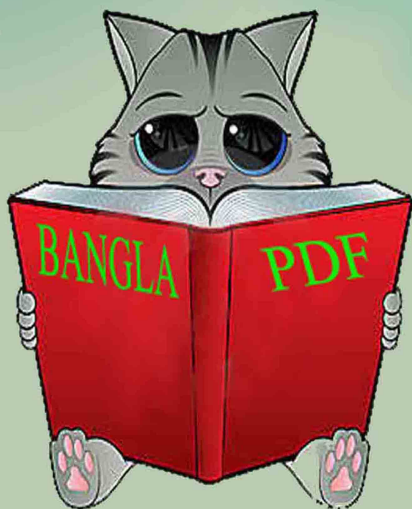
নীল দ্বীপের রাণী-৫১
নূরীর সন্ধানে-৫২

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

ইরানীর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার হস্তস্থিত ছোরাখানা নেমে এলো ধীরে ধীরে। দৃষ্টি সহসা ফিরিয়ে নিতে পারলো না বনহুর। কেমন যেন একটা অভিভূত ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

রহমান এবং বনহুরের অন্যান্য অনুচর যারা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলো তারা বিস্মিত হলো, হঠাৎ সর্দারের মধ্যে তারা বিরাট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো।

বনহুর যখন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ইরানীর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলো, রহমান বলে উঠলো—সর্দার।

চমকে উঠলো যেন বনহুর, বললো—এ্যাঁ---কিন্তু তার ছোরাসহ দক্ষিণ হাতখানা আর উদ্যত হলো না।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, একি করলেন? সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বনহুর বলে উঠলো—রহমান, মনসুর ডাকুকে এবারের মতও আমি ক্ষমা করলাম।

একসঙ্গে বনহুরের কয়েকজন অনুচর বিস্ময়কর শব্দ করে উঠলো—সর্দার!

মনসুর ডাকুর মুক্তি নিয়ে বনহুরের আস্তানায় ভীষণ একটা সাড়া পড়ে গেলো। কেউ ভেবে পাচ্ছে না হঠাৎ সর্দারের মধ্যে এ বিরাট পরিবর্তন এলো কি করে!

রহমান গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছে---- মনসুর ডাকুর মুক্তি—এ যেন একটা চরম ভয়ঙ্কর কাজ। কারণ মনসুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য কয়েকদিন পূর্বে সর্দার যেভাবে ক্ষেপে উঠেছিলো সে এক স্মরণীয় ব্যাপার। সর্দার নিজে গিয়েছিলো কান্দাই পর্বতের সেই গোপন গুহার অভ্যন্তরে, মনসুর ডাকুর গোপন আড্ডায়। সেখানে মনসুর ডাকুকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাকে বন্দী করে এনেছিলো বনহুর নিজে। আর আজ তাকে এভাবে মুক্তি দিলো। বিষধর সাপকে কেউ কি জীবিত ছেড়ে দেয়?

রহমান আপন মনে বসে ভাবছিলো, সেই সময় নাসরিন এসে বসলো তার পাশে।

রহমান কিছু বলবার পূর্বে বলে উঠলো নাসরিন —তোমার কি হয়েছে বলোতো? আজ ক'দিন থেকে তোমাকে সব সময় ভাবাপন্ন দেখছি?

গম্ভীর মুখে বললো রহমান—একটা বিরাট ভুল করেছে আমাদের সর্দার।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে নাসরিন—ভুল!

হাঁ।

ও, এবার বুঝেছি, সর্দার মনসুর ডাকুকে আবার মুক্তি দিয়েছে এই তো?

হাঁ, এ ভুল চরম ভুল। কারণ মনসুর ডাকু সর্দারকে হত্যা করার জন্য ভীষণভাবে উঠে পড়ে লেগে গেছে। কিভাবে তাকে বন্দী করবে বা নিহত করবে, সদা-সর্বদা এ নিয়ে নানারকম কৌশল অবলম্বন করে চলেছে সে।

নাসরিনের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে। সেও অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

রহমান আর নাসরিনে এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো, এমন সময় নূরী সেখানে উপস্থিত হলো। ব্যাপারটা সে এখনও শোনেনি, কারণ নূরী তার জাবেদকে নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকে আজকাল। জাভেদ এখন হাসতে শিখেছে, দু'একটা কথা বলতে শিখেছে। জাভেদের চঞ্চলতা দিন দিন বেড়ে চলেছে ভীষণভাবে, তাই নূরীর ব্যস্ততাও বেড়েছে, কোনোদিকে খেয়াল নেবার সময় নেই তার।

রহমান আর নাসরিনের চিন্তার কারণ সম্বন্ধে নূরী যখন সব জানতে পারলো তখন তার মুখখানাও গম্ভীর হলো। মনসুর ডাকুকে হত্যা করতে গিয়ে হঠাৎ বনহুরের মধ্যে পরিবর্তন এলো কেন, সেও ভেবে পেলো না।

এক সময় বনহুরকে নিভৃতে পেয়ে নূরী এসে বসলো তার পাশে, ওর চুলের ফাঁকে আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললো সে—হুর, একটা কথার সঠিক জবাব দেবে?

বনহুর সম্মুখের পাথুরে টেবিলে রাখা স্তূপাকার আংগুরের মধ্য হতে একটা থোকা তুলে নিয়ে মুখে পুরে বললো—কবে তোমার কথায় সঠিক জবাব দেইনি বলো?

আচ্ছা বলোতো, মনসুর ডাকুকে সেদিন কেন তুমি ক্ষমা করেছিলে?

পূর্বে যে কারণে করেছিলাম সেই কারণে।

এ তুমি কি করেছো হুর? যে তোমাকে হত্যার নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে, যে তোমাকে বিষদৃষ্টি নিয়ে দেখে যে তোমার রক্ত শুষে নেবার জন্য পাগল, তুমি তাকে হাতের মুঠায় পেয়েও হত্যা করোনি? তাকে আবার তুমি মুক্তি দিয়েছো?

নূরীর কথায় বনহুরের মুখে কোনো পরিবর্তন আসে না, সে যেভাবে আংগুর চিবুচ্ছিলো সেইভাবে চিবুতে থাকে।

নূরী ব্যস্তকণ্ঠে বলে—কখনও তুমি হিংস্র পশুরাজ সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর, কখনও তুমি মেষ শাবকের চেয়েও নিরীহ—তুমি কি বলোতো?

এবার বনহুর হাসে—আমি মানুষ।

মানুষ হলে অমন হয় না, তার মধ্যেও আছে মনুষ্যত্ব-বোধক প্রাণ। তোমার মধ্যে কিছু নেই—সব তোমার খামখেয়ালী--

শুধু আমি নই, পৃথিবীটাই খামখেয়ালী নূরী। দেখছো না এই পৃথিবীর কত রঙ? কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় ফানুসের মত। খামখেয়ালী পৃথিবীর বুকে আমারও জন্ম হয়েছে, তাই আমিও খেয়ালী, বুঝলে? যাক্ বলো জাভেদ কোথায়?

নূরী বুঝতে পারে, বনহুর মনসুর ডাকুর মুক্তির ব্যাপার নিয়ে কথা বাড়াতে চায় না, তাই সে জাভেদের কথা পেড়ে তাকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছে। নূরীও কথার মোড় ফেরায় বলে সে—জাভেদ দাইমার কোলে বসে খেলা করছে।

বনহুর আর একটা ঝোপা আংগুর হাতে তুলে মুখের কাছে ধরে বলে—কবে জাভেদ বড় হবে, ওকে আমি অস্ত্র শিক্ষা দেবো--

তুমি বুঝি হাঁপিয়ে উঠছো ওকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে না পেরে?

হাঁ বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি। সত্যি নূরী, সেদিনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বাপুর কাছে যেদিন প্রথম অস্ত্র-শিক্ষা শুরু করলাম, সেদিন কি যে আনন্দ। বাপু আমার হাতে ছোট্ট একটা তরবারি দিয়ে বললো, এসো বনহুর, আমাকে তুমি পরাজিত করবে, এসো।

তুমি কি করলে?

আমি বাপুর হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়ালাম, জানি না সেদিন কিসের যেন একটা উন্মাদনা আমাকে উন্মাদ করে তুললো। আমি বাপুকে আঘাতের পর আঘাত করে চললাম। বাপু হাসিমুখে আমার আঘাত তার তরবারি দ্বারা প্রতিরোধ করে চললো। বাপু আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সাবাস বেটা! সেই দিন থেকে আমার মধ্যে জেগে উঠলো একটা নতুন মানুষ।

নূরী মৃদু হেসে বললো—সেই হলো পাথুরে মানুষ দস্যু বনহুর!

তা যা খুশি তুমি তাই বলতে পারো নূরী। সেদিন আমার কচি মনে এক অসীম শক্তির উদ্ভব ঘটেছিলো যা আজও আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নূরী, আমার উপর বাপুর ভরসা ছিলো—একদিন বড় হবো, তার আশা পূর্ণ করবো---

সে আশা তুমি পূর্ণ করেছো হুর, বাপুর সাধ তুমি পূর্ণ করেছো। আজ তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু---

আমার আশা, আমার সাধ পূর্ণ করবে জাভেদ। ওকে মস্তবড় দস্যু করবো। যার প্রচণ্ড দাপটে পৃথিবীর সমস্ত অমানুষ প্রকম্পিত হয়ে উঠবে।

তোমার দাপটেই দেশবাসী অস্থির তদুপরি জাভেদ যদি দস্যু হয় তাহলেতো কথাই থাকবে না। তোমার ছেলে তোমার মত হবে আমি জানি।

সত্যি! সত্যি বলছো নূরী?

হাঁ।

বনহুর নূরীকে টেনে নিলো কাছে।

নূরী বনহুরের প্রশস্ত বুকে মাথা রাখলো।

এমন সময় দাইমা জাভেদসহ হাজির হলো সেখানে।

জাভেদের অর্ধস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—আ-ব্বা-ব্বা--বা--

নূরী সরে দাঁড়ায় বনহুরের পাশ থেকে।

বনহুর দাইমা ও জাভেদের দিকে এগিয়ে আসে। হাত বাড়ায় সে জাভেদের দিকে—জাভেদ--এসো--এসো আব্বু--

জাভেদ দন্তবিহীন মুখে ফিক্ ফিক্ করে হেসে হাত বাড়ালো পিতার দিকে।

বনহুর দাইমার কোল থেকে ওকে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো। চুমুর পর চুমু দিয়ে হাসতে লাগলো।

বনহুর যখন দাইমার কোল থেকে নূরকে নিয়ে আদর করছিলো তখন হঠাৎ তার কক্ষের সংকেতসূচক নীল-লাল বাল্বগুলোর একটি বাল্ব জ্বলে উঠলো।

নূরী এবং বনহুরের সেদিকে খেয়াল ছিলো না।

দাইমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সাংকেতিক আলোর বাল্বটা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্ফুট শব্দে বলে উঠলো সে—বনহুর দেখো---দেখো--বিপদ-সংকেত আলো জ্বলে উঠেছে--

বনহুর আর নূরী একসঙ্গে তাকালো কক্ষের দক্ষিণ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর এবং নূরীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

বনহুর জাভেদকে নূরীর কোলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

সমস্ত আস্তানায় তখন বিপদ-সংকেত ধ্বনি হচ্ছে।

বনহুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে ওয়্যারলেস কক্ষের দিকে।

চারিদিক থেকে ছুটে আসে বনহুরের অনুচরগণ।

বনহুর ওয়্যারলেস মেশিনের সুইচ টিপে দিতেই জ্বলে উঠলো লাল আলোটা, ওয়্যারলেসে ভেসে এলো নারী কণ্ঠস্বর--বনহুর সাবধান হও, তোমার আস্তানার দিকে এগিয়ে চলেছে একদল নররক্ত পিপাসু নিগ্রো রাক্ষস---এরা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি সাংঘাতিক --এরা ঝাম জঙ্গল থেকে এসেছে--এদের সঙ্গে আছে মারাত্মক বিষাক্ত অস্ত্র--লড়াইয়ে কেউ জয়ী হতে পারবে না--

বনহুর ওয়্যারলেস বক্সে মুখ রেখে বললো—কে তুমি আমাকে সাবধান করে দিচ্ছো--

--আমি আশা--কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই--যাও শীগ্গীর --ওদের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করো--

এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আশার কথা ভাববার সময় নেই বনহুরের কারণ আস্তানার বাইরে তার আস্তানারক্ষী অনুচরগণ বিপদ সংকেত শব্দ পাঠাচ্ছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদ না দেখলে এ বিপদ-সংকেত শব্দ করা হয় না।

বনহুর ওয়্যারলেস কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই রহমান সহ অন্যান্য অনুচর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সকলের চোখেমুখেই ভীষণ উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রহমান বললো—সর্দার, আস্তানার উচ্চ কক্ষ হতে মালেক মিয়া জানালো, একদল জমকালো মানুষ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের আস্তানার দিকে এগিয়ে আসছে--

হাঁ, ঐ রকম কথাই আশা আমাকে জানালো কিন্তু সে কোথা থেকে আমাকে এভাবে সাবধান করে দিলো বুঝতে পারলাম না। যাক্ সে কথা এখন ভাববার সময় নেই, তোমরা এসো। ভূগর্ভ আস্তানার সর্বোচ্চ ক্ষুদে কক্ষে এসে ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুর, খালি চোখে যতদূর দৃষ্টি যায় লক্ষ্য করে তেমন কিছু দেখা গেলো না। বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই দেখতে পেলো অসংখ্য নিগ্রো অস্ত্র হাতে তীরবেগে এদিকে ছুটে আসছে। বনহুর বললো—রহমান, অগণিত জমকালো বেঁটে মানুষ এদিকে দ্রুত ছুটে আসছে--

সর্দার, ওরা কাদের লোক কি উদ্দেশ্যেই বা এদিকে আসছে?

উদ্দেশ্য যে কিছু আছে সেটা ঠিক। কিন্তু এরা কাদের লোক আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যতদূর বুঝা যাচ্ছে ওরা কোনো দ্বীপবাসী জংলী নিগ্রো লোক।

সর্দার, ওরা অতি ভয়ঙ্কর।

হাঁ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এরা তা ছাড়া আশা জানিয়েছে এদের হাতে নাকি রয়েছে মারাত্মক বিষাক্ত অস্ত্র। সম্মুখ যুদ্ধে এদের সাথে কেউ জয়ী হতে পারবে না। রহমান?

বলুন সর্দার।

ওরা আমাদের আস্তানার নিকটবর্তী হবার পূর্বেই ওদের গতিরোধ করতে হবে। রহমান, আমাদের আস্তানার চারপাশে যে বিরাট খাদ ঢাকা আছে মাটির স্তর দিয়ে, সেই খাদ উদ্ঘাটন করে দাও।

রহমান চলো ভূগর্ভ মেশিনকক্ষের দিকে।

রহমানকে সাহায্য করতে চললো আরও কয়েকজন অনুচর।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছে, অসংখ্য নিগ্রো ছুটে আসছে তীরবেগে, সূর্যের আলোকে তাদের হাতের অস্ত্রগুলি ঝকমক করছে।

এখন নিগ্রোগুলো অতি নিকটে এসে পড়েছে।

বনহুর রহমানকে জানিয়ে দিলো এবার খাদের মেইন যন্ত্রের ঢাকা খুলে দিতে।

রহমান ভূগর্ভ মেশিনকক্ষ হতে শুনতে পাচ্ছে সর্দারের নির্দেশ। সেইমত সে কাজ করে চললো। নিগ্রোদল এগিয়ে আসতেই রহমান খাদের মুখ খুলে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নিগ্রো খাদের মধ্যে সমাধি লাভ করলো।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত প্রায় অর্ধেকের বেশি হিংস্র নিগ্রো পড়ে গেলো খাদের মধ্যে। বাকি যারা রইলো তারা ভীষণ ভয় পেয়ে পিছু হটে পালাতে লাগলো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—বনহুরের মুখে ফুটে উঠলো হাসির রেখা।

এক ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পেলো বনহুরের অনুচরগণ। বনহুর আশাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলো না, কারণ সে-ই সর্বপ্রথম বিপদ-সংকেত জানিয়ে বনহুরের আস্তানা রক্ষীদের সাবধান করে দিয়েছিলো।

বনহুর এবার ভেবে চলে আশা কোথা থেকে তাকে এ সংকেত জানালো? তার উপকার করেই বা কি লাভ হচ্ছে আশার? কে সে নারী যে তাকেও ঘোলাটে করে তুলেছে। বনহুর আশার সন্ধানে রহমানকে নিযুক্ত করেছিলো কিন্তু সে হতাশ হয়েছে। বনহুর নিজেও আশাকে বহুভাবে অন্বেষণ করে ফিরেছে তবু তাকে আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি আজও।

বনহুরের ললাটে একটা গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠে।

❑

একদিন গভীর রাতে বনহুর ঝর্ণার পাশে এসে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু ঝর্ণার জলধারার কল কল শব্দ ছাড়া আর কোনোকিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর তাজকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে এগিয়ে এলো ঝর্ণার পাশে। জোছনার আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। চাঁদের আলো ঝরণার জলে পড়ে অপূর্ব এক শোভা বিস্তার করেছে।

একটা পাথরের উপরে বসে পড়লো বনহুর।

ঝর্ণার রূপালী জলধারার দিকে তাকিয়ে ছিলো বনহুর আনমনে। বহুদূরে সে গিয়েছিলো তার জম্বুর আস্তানায়। এখানে সে জম্বুর আস্তানার কথাগুলোই ভেবে চলেছে। সেখানে গিয়েছিলো বনহুর আশার খোঁজে। কারণ জম্বু আস্তানা থেকেই আশা ওয়্যারলেসে কয়েকবার তার সঙ্গে কথা বলেছে। বনহুর জম্বুর আস্তানার সর্দার কাসেম খাঁর কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলো কে তাকে এখান থেকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলো নীলনদের সেই জাহাজে। তারপর আরও কয়েকবার জম্বু আস্তানা থেকে আশা কথা বলেছে। কাসেম খাঁ তাকে যে অদ্ভুত বাণী শুনিয়েছে সত্যি তা বিস্ময়কর। একদিন কাসেম খাঁ নাকি তার বিশ্রামকক্ষে আরাম করছিলো, অন্যান্য অনুচর সবাই বিশ্রাম করছে ঠিক সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত নারী মূর্তির আবির্ভাব ঘটলো। চমকে উঠলো সবাই, কারণ যেখানে কোনো পিপীলিকা প্রবেশে সক্ষম নয় সেখানে একটা জীবন্ত মানুষ কি করে প্রবেশ করলো। সবাই তখন অস্ত্র বিহীন অবস্থায় ছিলো কিন্তু সেই নারীমূর্তি হস্তে ভয়ঙ্কর দুটি আগ্নেয় অস্ত্র। কেউ কোনো কথা বলার পূর্বেই বলে উঠলো নারীমূর্তি --খবরদার, এক চুল নড়বে না বা কোনো অস্ত্র ধারণ করবে না। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা নিয়ে এসেছি। শুধু তোমাদের ওয়্যারলেসটা আমি ব্যবহার করবো। কাসেম খাঁ তার অনুচরদের নীরব থাকার আদেশ দিয়েছিলো এবং সে নিজেও কোনো অস্ত্র ধারণ করেনি। কাসেম খাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিলো, কে এই নারী আর কিইবা তার উদ্দেশ্য? নারীমূর্তি ওয়্যারলেসে কথা বলা শেষ করে যেমন এসেছিলো তেমনি নীরবে বেরিয়ে গিয়েছিলো। প্রয়োজন হয়নি তার উপর কঠিন আচরণ প্রয়োগ করতে। এরপর আরও কয়েকবার সেই বিস্ময়কর নারীর আগমন ঘটেছিলো, কাসেম খাঁর অনুমতি নিয়েই সে ওয়্যারলেস ব্যবহার করেছিলো। কাসেম খাঁও অনেক চেষ্টা করে সেই নারীমূর্তির চেহারা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ করে উঠতে পারেনি। সেও জানে না কে সেই নারী--

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে অনুভব করে কেউ তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বনহুর দ্রুত ফিরে তাকায়। এ যে সেই নারীমূর্তি যার সমস্ত দেহ কালো আবরণে আচ্ছাদিত। এমনকি হাতে কালো গ্লবস পরা পায়ে বুট মাথায় মুকুটের মত কালো আবরণী তারই অংশ দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল ঢাকা। শুধু ঠোঁট দুটো দেখা যাচ্ছে জোছনার আলোতে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালো, বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সেই অদ্ভুত নারীমূর্তির দিকে।

নারীমূর্তি বলে উঠলো —জানি তুমি আমার কথাই ভাবছিলে। কে আমি জানতে তোমার বড় সখ হচ্ছে, না?

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো।

নারীমূর্তি হেসে বললো—-ভাবছো এই মুহূর্তে আমাকে তুমি আবিষ্কার করতে পারো। আমার রহস্যময় চেহারাটিকে তুমি উদ্ঘাটন করতে পারো কিন্তু আমি জানি, তুমি তা পারবে না।

এবার বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো, অধর দংশন করে বললো—পারবো না?

না, পারবে তুমি আমাকে আবিষ্কার করতে।

কে তুমি?

বলেছি তুমি আমাকে জানতে চেওনা।

না, তা হবে না। আজ আমি তোমার পরিচয় জানতে চাই। বনহুর নারীমূর্তিটিকে ধরে ফেলে খপ্ করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নকল হাত খুলে আসে বনহুরের হাতের মুঠায়। নারীমূর্তি যেন হাওয়ায় মিশে যায় মুহূর্তে। বনহুরের কানে ভেসে আসে একটা খট্ খট্ আওয়াজ। অশ্বপদ শব্দ সেটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর যেন থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এমনভাবে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ধোকা দিয়ে পালাতে পারেনি।

বনহুর জোছনার আলোতে হাতখানা তুলে ধরলো চোখের সম্মুখে, গ্লাব্স পরা একটি রবারের হাত। বনহুর যখন হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে তখন আর পায়ের কাছে খসে পড়লো একখানা ভাঁজ করা চিঠি। চিঠিখানা ঐ নকল হাতের মধ্যে ছিলো বুঝতে পারে বনহুর।

উবু হয়ে বনহুর চিঠিখানা তুলে নিলো, তারপর জোছনার আলোতে চোখের সামনে মেলে ধরলো। লেখাগুলো স্পষ্টই নজরে পড়লো বনহুরের, সে পড়তে লাগলো আপন মনে—

> "বনহুর যতই তোমাকে দেখছি ততই আমি বিস্মিত হচ্ছি। তোমার মধ্যে আমি খুঁজে পাচ্ছি আমার স্বপ্নে গড়া সেই সম্রাটকে—যার জন্য আমার এই সাধনা তাকে।"
>
> —আশা

চিঠিখানা পড়ে বনহুরের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো, ভাঁজ করে চিঠিটা রাখলো সে প্যান্টের পকেটে। বসা আর হলো না, ঝর্ণার ধারে বসে ক্লান্তি দূর করবে ভেবেছিলো বনহুর- তা আর হলো না। তাজের পাশে এসে পিঠ চাপড়ে বললো—চল্ যাই।

আস্তানায় ফিরে তাজকে অনুচরদের হাতে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর। নূরী অপেক্ষায় বসে ছিলো বনহুরের বিশ্রামকক্ষে।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই নূরী উঠে দাঁড়ালো বললো—ফিরতে এত দেরী হলো কেন হুর?

নূরীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে বনহুর হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো।

নূরী বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে। মনে তার নানারকম প্রশ্ন উঁকিঝুকি মারছে। বনহুর নূরীর মনোভাব বুঝতে পেরে পকেট থেকে আশার দেওয়া চিঠিখানা বের করে এগিয়ে দেয় নূরীর দিকে, বলে—পড়ে দেখো।

নূরীর মনে বিস্ময় তখনও কমেনি, সে বনহুরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে গম্ভীর হয়ে পড়লো। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—হুঁ, বুঝেছি।

কি বুঝেছো নূরী?

বলো আশা কে?

জানিনা।

আরও একদিন আমি তোমার কাছে আশাকে জানতে চেয়ে বিমুখ হয়েছি। আশা সম্বন্ধে তুমি আমাকে জানাতে চাওনি।

জানাতে চাইনি নয়, জানাতে অক্ষম হয়েছি। বিশ্বাস করো নূরী, আমি নিজেই আশাকে চিনি না।

যে নারী তোমাকে এতখানি--

সে অপরাধ আমার নয়। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে বা ভালবেসে ফেলে সে দোষ কার বলো? সত্যি বলছি আমি আশাকে চিনি না জানি না।

নূরী আর বনহুরের যখন কথা হচ্ছিলো তখন বনহুরের এক অনুচব এসে দাঁড়ালো দরজার বাইরে—সর্দার।

বনহুর বললো —কে কাওসার?

হাঁ সর্দার।

এসো।

কাওসার ভিতরে প্রবেশ করলো, হাতে তার একটা নীল রংয়ের চিঠি। বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে চিঠিখানা এগিয়ে ধরলো—সর্দার, এ চিঠিখানা রায়হান বন্দর থেকে আমাদের গুপ্তচর পাঠিয়েছে।

গুপ্তচর জমশেদ আলী?

হাঁ সর্দার।

বনহুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে।

নূরী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে। চিঠিখানা পড়ে বনহুরের মুখোভাব ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়লো। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—নীল দ্বীপের রাণী--

নূরীর চোখেমুখেও একরাশ বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—কার চিঠি?

বনহুর বললো—নীল দ্বীপের রাণীর চিঠি।

নীল দ্বীপের রাণী—কে সে?

আমার মনেও সেই প্রশ্ন জাগছে নূরী। নীলদ্বীপ সে তো নীলনদের ওপারে। সেই দ্বীপের রাণীর চিঠি।

কাওসার আর একখানা চিঠি বের করে বললো—সর্দার, এই চিঠিখানা জমশেদ আলী লিখেছে।

দাও। হাত বাড়ালো বনহুর কাওসারের দিকে।

কাওসার চিঠিখানা দিলো বনহুরের হাতে। বনহুর চিঠিখানা নিয়ে পড়তে লাগলো—

> সর্দার, নীলরংয়ের কাগজে লেখা নীলদ্বীপের রাণীর যে চিঠিখানা পাঠালাম ওটা আমি এক ভিখারীর ঝোলা থেকে পেয়েছি। যার ঝোলা থেকে ওটা পেয়েছি তাকে আমাদের রায়হান আস্তানায় বন্দী করে রেখেছি।
>
> —জমশেদ

বনহুর আবার নীল রংয়ের চিঠিখানা মেলে ধরলো। নূরী বললো—পড়ো দেখি কি লিখা আছে ওটাতে? বনহুর পড়লো—হিংগু, তোমার কথামত কাজ হচ্ছে না প্রতি সপ্তাহে আমার মন্দিরে একটি যুবক বলি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি জীবনলাভে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু প্রতিমাসে একটি যুবক বলি হচ্ছে। এবার আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।

—নীল দ্বীপের রাণী

বনহুর চিঠি পড়া শেষ করে বললো—নীল দ্বীপের রাণীর সখ তো মন্দ নয়। শিশু বা বালকের রক্ত নয়, যুবকের রক্ত তার প্রয়োজন —হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর কথা।

বনহুরের হাসি দেখে মনে মনে শিউরে উঠলো নূরী, বললো —আশ্চর্য যুবকের রক্ত দিয়ে নীলদ্বীপের রাণী কি করে?

আমিও তাই ভাবছি নূরী। কাওসার?

বলুন সর্দার।

তুমি ফিরে যাও রায়হানে, জমশেদ আলীকে বলবে সেই ভিখারীকে যেন আটক রাখে। আমি কাল ভোরেই রায়হানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো।

আচ্ছা সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো কাওসার।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরলো— তুমি যাবে সেই নীল দ্বীপে?

যেতে যে আমাকে হবেই নূরী।

এ তুমি কি বলছো হুর।

আমি দেখতে চাই নীল দ্বীপের রাণী কে আর কেনই বা সে যুবকের রক্ত গ্রহণ করে চলেছে।

আমি তোমাকে সেই রাক্ষুসীর দেশে যেতে দেবো না হুর। কিছুতেই না......

নূরী, জানো এর প্রতি আমার কতখানি দায়িত্ব রয়েছে? কত নিরীহ যুবককে বিনাদ্বিধায় ওখানে হত্যা করা হচ্ছে। আমার মনে হয়, এর পেছনে আছে গভীর কোনো রহস্য। নূরী, নীল দ্বীপের রাণীর এ রহস্য আমাকে উদঘাটন করতেই হবে।

কি জানি আমার মনে কেমন যেন আশঙ্কা হচ্ছে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে যেন।

দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই নূরী। বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরলো উঁচু করে।

নূরীর চোখ দুটো ছল হয়ে উঠলো, কোনো কথা বলতে পারলো না।

নূরীর ইচ্ছা না থাকলেও পরদিন সে নিজ হাতে বনহুরকে সাজিয়ে দিলো। এগিয়ে দিলো সে আস্তানার বাইরে পর্যন্ত।

বনহুরের সঙ্গে চললো তার প্রধান সহচর রহমান।

❑

সর্দার, এই সেই ভিখারী, যার কাছে পাওয়া গেছে নীল দ্বীপের রাণীর নীল চিঠি। কারাকক্ষে এক বন্দীকে দেখিয়ে বললো— জমশেদ আলী।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বন্দীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। ভালভাবে দেখে নিয়ে বললো বনহুর—বৃদ্ধ তোমার নাম?

বৃদ্ধ তার ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের মুখে, তারপর বললো— আমার নাম হরিশ চন্দ্র। আর তোমার নাম?

বনহুর হেসে বললো— আমার নাম একটু পরেই জানতে পারবে। এবার বলো নীল দ্বীপের রাণী কে ?

নীল দ্বীপের রাণী আমাদের রাণী, এই তার পরিচয়। হাঁ, তার চিঠি তোমার হস্তগত হয়েছে, কাজেই আমি........

হাঁ, কিছু গোপন করতে গেলে বুঝতেই পারছো তোমার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

আমাকে তোমরা হত্যা করবে?

হত্যা— সে স্বাভাবিক হত্যা নয়। সে হত্যা হবে এক ভীষণ অবস্থায়। তোমার দেহ থেকে প্রাণ বের হবার পূর্বে তোমার দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেটে বাদ দেওয়া হবে, মানে তোমার হাত-পা-কান-নাক সব কেটে ফেলা হবে—সব শেষে বাদ দেওয়া হবে তোমার মাথাটা। বলো নীল দ্বীপের নীল রাণী কে?

পুনরায় বৃদ্ধ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—বললাম তো সে আমাদের রাণী।

বনহুর পকেট থেকে নীল রংয়ের সেই চিঠিখানা বের করে বৃদ্ধের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে— এ চিঠি তুমি পড়েছিলে?

হাঁ, ও চিঠি আমার কাছে লিখা হয়েছিলো, কাজেই আমি পড়েছি।

বেশ, যেভাবে তুমি এ চিঠির কথা স্বীকার করলে সেই ভাবে সব কথা তুমি আমার কাছে স্বীকার করবে নচেৎ তোমার মৃত্যুর শাস্তি পূর্বেই অবগত হয়েছো হরিশচন্দ্র দেব।

দেব আমি নই, শুধু হরিশচন্দ্র বলেই ডাকবে। দেখো তুমি কে এবং কি তোমার নীতি জানি না, তবে এটুকু আমি বুঝতে পারছি, তুমি সাধারণ ব্যক্তি নও। তোমার চেহারা, তোমার কণ্ঠস্বর সত্য আমাকে অভিভূত করেছে। শুনবে, সত্যি তুমি আমার সব কথা শুনবে?

হাঁ, তোমার কাছে আমি সব জানতে চাই কিন্তু কোনো একটা শব্দ মিথ্যা হলে পরিত্রাণ নেই আমার কাছে।

বৃদ্ধ বললো এবার—মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই, কারণ প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি করে যুবক সংগ্রহ করতে হবে নচেৎ আমাকে প্রাণ দিতে হবে। আমি এতে অক্ষম, কাজেই বুঝতে পারছো মৃত্যু আমার শিয়রে প্রতীক্ষা করছে। তাছাড়া আমি এখন শেষ ধাপে এসে পৌছেছি, মিথ্যা বলার আমার কোনোই প্রয়োজন নেই। হাঁ, একটা প্রশ্ন আমি তোমায় করবো, জাবাব দেবে তো?

বনহুর বললো— দেবো।

বৃদ্ধ বললো—তুমি কে প্রথমে আমার জানা দরকার।

বনহুর তাকালো জমশেদ আর রহমানের দিকে।

বনহুরের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো তারা।

জমশেদ বললো— সর্দার, ওকে নিজ পরিচয় না দেওয়াই সমীচীন।

রহমান ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো— বৃদ্ধকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয় সর্দার।

বৃদ্ধ হেসে উঠলো—একটা মৃত্যুপথের যাত্রীর কাছে তোমাদের এত দ্বিধা? আমি শপথ করছি........

বনহুর বলে উঠলো— শপথের কোনো প্রয়োজন হবে না বৃদ্ধ, কারণ দস্যু বনহুরের হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে না কোনোদিন।

মুহূর্তে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বৃদ্ধের। উচ্ছ্বসিতভাবে বললো—জয় মা কালী, পেয়েছি, পেয়েছি মা তোর সেই সন্তানকে। পেয়েছি তার সন্ধান......বৃদ্ধ বনহুরের পা থেকে মাথা অবধি তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলো। সে যেন কোনো হারানো মানিকের সন্ধান পেয়েছে, এমনি ভাব ফুটে উঠলো তার মুখমণ্ডলে।

রহমান এবং জমশেদ আলীর চোখেমুখেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধের আচরণ তাদের কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। বৃদ্ধ যেভাবে বনহুরকে লক্ষ্য করছিলো তাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

এবার বৃদ্ধ বলে উঠলো— আমি তাহলে ঠিক যায়গায় এসে পৌঁছে গেছি! দস্যু বনহুরের আস্তানায়......হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ জয় মা কালী......জয় মা কালী......একটু থেমে বললো বৃদ্ধ—বাবা বনহুর, আমি বহুদিন হতে তোমার সন্ধান করে ফিরছি, আজ ভগবান আমার বাসনা পূর্ণ করেছেন।

বৃদ্ধের কথাবার্তা এবং আচরণে বনহুরও কম অবাক হয়নি, সে নিশ্চুপ লক্ষ্য করছিলো তাকে। বৃদ্ধের বয়স কম নয়, প্রায় আশির কাছাকাছি হবে। সুদীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গৌর দেহের রঙ, প্রশস্ত ললাটে চন্দনের তিলক, উন্নত নাসিকা। মুখে একমুখ শুভ্র দাড়ি। মাথায় শুভ্র কুঞ্চিত রাশিকৃত চুল। কাঁধে ছেঁড়া কাঁথার তৈরি ঝোলাটা এখনও ঝুলছে। বৃদ্ধ বললো এবার—মুক্তি আমি চাই না বনহুর, আমি চাই তুমি সেই রাক্ষসীর কবল থেকে রক্ষা করবে দেশের শত শত নিষ্পাপ নিরীহ যুবকদেরকে। হাঁ, আমি যা বলবো তাই করবে তো?

বললো বনহুর— যদি তোমার কথা মঙ্গলজনক হয় তবে করবো।

বৃদ্ধ জমশেদ আলী আর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললো—এদের বাইরে যেতে আদেশ দাও, আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতে চাই।

বনহুর ইংগিত করলো।

জমশেদ আলী আর রহমান বেরিয়ে গেলো।

বৃদ্ধ বললো—বসো, আমার পাশে বসো তুমি।

বনহুর বসলো বৃদ্ধের পাশে।

বৃদ্ধ বলতে শুরু করলো— নীলনদের ওপারে আছে এক দ্বীপ, তার নাম নীল দ্বীপ।

হাঁ, সে দ্বীপের নাম আমি শুনেছি হরিশচন্দ্র। আমি জানতে চাই নীল দ্বীপের রাণীটি কে?

সে কথাই তোমাকে বলবো বৎস। নীলদ্বীপের নীল রাণী মহারাণী বা সম্রাজ্ঞী নয়, সে কাপালিক জয়দেবের কন্যা জয়া। এই নারী মাতৃস্থানীয়া হয়েও মাতা নয়, সে রাক্ষুসী.....থামলো বৃদ্ধ।

বনহুর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধের মুখে।

বৃদ্ধ বলে চললো—কাপালিক জয়দেব নীল দ্বীপের বনাঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলো। তার প্রতাপে নীলদ্বীপের মহারাজ হীরন্ময় সেনগুপ্তও ভীতভাবে রাজ্যে বাস করতেন। জয়দেবের ভীষণ আচরণে এ দ্বীপে শান্তি ছিলো না। দ্বীপবাসীরা সদা-সর্বদা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াতো। কারণ জয়দেব ছিলো রক্তপিপাসু কাপালিক। তার আখড়ায় ছিলো কালী মন্দির, প্রতি অমাবস্যায় এ মন্দিরে নরবলি হতো। এ নরবলির জন্য নব সংগ্রহের ভার ছিলো মহরাজ হীরন্ময় সেনগুপ্তের উপর। যেখান থেকে হোক একটি নর তাঁকে সংগ্রহ করে দিতে হবে প্রতি অমাবস্যায়।

থামলো বৃদ্ধ ভিখারী তাপসী।

বনহুর বিপুল উন্মাদনা নিয়ে বৃদ্ধের কথাগুলো শুনে যাচ্ছে! সে যেন কোনো এক কল্পনা জগতে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত এক আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তার বুকের মধ্যে। বললো বনহুর—তারপর?

মহারাজ হীরন্ময় যেন গুপ্ত প্রাণভয়ে এবং রাজ্যের মঙ্গল আশায় গোপনে প্রতি অমাবস্যায় একটি করে নর সংগ্রহ করে চললেন। এ কারণে তাকে গোপনে বহু অর্থ ব্যয় করতে হতো। রাজার আদেশ কেউ অমান্য করতে সাহসী হতো না। তারা অর্থের লোভে ও মহারাজের আদেশে এ কাজে আত্মনিয়োগ করলো। কিন্তু কতদিন তারা এভাবে দেশের সর্বনাশ করবে—প্রতি মাসে একটি করে লোক তারা পাবেই বা কোথায়, তবু রাজ আদেশ তাদের পালন করতেই হবে। একদিন হীরন্ময়ের রাজকর্মচারিগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, তারা সবাই বিমুখ হয়ে বসলো, এ জঘন্য কাজ তারা আর করতে পারবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও মহারাজ তার কর্মচারীদের রাজি করাতে সক্ষম হলেন না।

বনহুরের মুখে এক দৃঢ়ভাব ফুটে উঠেছে। দু'চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়! স্তব্ধ হয়ে শুনছে সে বৃদ্ধের কথাগুলো। বৃদ্ধ বলে যাচ্ছে—একদিন দু'দিন তিন দিন করে তিনটি মাস কেটে গেলো। তিনটি অমাবস্যায় মহারাজ হীরন্ময় কাপালিক জয়দেবকে নরবলির জন্য কোনো নর দিতে পারলেন না। হীরন্ময় অহরহ দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়লেন, তিনি জানতেন কাপালিক জয়দেব কত ভয়ঙ্কর। তাই সদা ভীতভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন গভীর রাতে মহারাজের শয়নকক্ষে হাজির হলো সেই কাপালিক সন্ন্যাসীর বেশে। হীরন্ময় কাপালিককে দেখে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন, কারণ কাপালিক

হস্তে ছিলো এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু অস্ত্র খর্গ। খর্গ দ্বারা সে বিনা দ্বিধায় মহারাজকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে পারে। বললো কাপালিক—আমার কথা অমান্য করার সাহস কি করে তোমার হলো? সুখ নিদ্রায় অভিভূত রয়েছো, মনে আছে আমার কথা? হীরন্ময় কম্পিত কণ্ঠে করজোড়ে বললেন—আছে কিন্তু আমি অক্ষম সন্ন্যাসী বাবাজী! কারণ আর কোনো লোক আমি পাচ্ছি না যাকে আপনার জন্য দিতে পারি। কাপালিকের চক্ষু দিয়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে থাকে। সেই মুহূর্তে কাপালিক মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, মহারাজ সম্মুখে মৃত্যুদূত দেখে শিউরে উঠলেন, কাপালিকের পা জড়িয়ে ধরে বললেন মহারাজ আবার—আমি কথা দিচ্ছি, যেমন করে পারি আপনার বলির জন্য প্রতি অমাবস্যায় একটি করে লোক সংগ্রহ করে দেবো। কাপালিক বজ্রকঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো—প্রতি অমাবস্যায় নয়, প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি লোক দিতে হবে, যদি অক্ষম হও তবে তোমার মাথা দিতে হবে।

বনহুর বললো—তারপর?

মহারাজ হীরন্ময় চোখে অন্ধকার দেখলেন কিন্তু কোনো উপায় নেই, কাপালিকটির কবল থেকে উদ্ধারের পথ বন্ধ। মহারাজ তার কর্মচারীদের প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে এবং ভয় দেখিয়েও কোনো ফল হলো না। শেষ পর্যন্ত নিজ পুত্রকে বলির জন্য কাপালিক হস্তে তুলে দেওয়াই স্থির করলেন হীরন্ময়। এ কথা বলতে গিয়ে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বৃদ্ধ ভিখারীর গলা।

বনহুর লক্ষ্য করলো, বৃদ্ধের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু ধারা। নিজকে অতি কষ্টে সংযত করে নিয়ে বললো বৃদ্ধ আবার—হীরন্ময় যেন নিজ পুত্রকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেলেন সেই নীলদ্বীপের গহন জঙ্গলে। যুবক সমীর যেন গুপ্ত বুঝতে পারলো না পিতার মনোভাব, সেও বিনা দ্বিধায় পিতার সঙ্গে এসে হাজির হলো সেই ভয়ঙ্কর নররাক্ষস কাপালিক জয়দেবের কালী মন্দিরে......থামলো বৃদ্ধ ভিখারী। তার মনে যে গভীর একটা বেদনা চাপ ধরে উঠছে স্পষ্ট বুঝা গেলো। একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে বললো বৃদ্ধ—সমীর সেন সহ হীরন্ময় যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন তখন সমীর সেন পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো— বাবা এখানে আমাকে কেনো নিয়ে এলে? হীরন্ময় পুত্রের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তিনি ভয়ঙ্কর এক মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

বলো, তারপর কি হলো? অধীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

ভিখারীর চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠলো, ব্যথাজড়িত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে—হীরন্ময় যখন কাপালিকের আগমন প্রতীক্ষা করছে তখন যুবক সমীর সেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, সে যেন বুঝতে পেরেছে তার পিতা তাকে

কোনো অভিসন্ধি নিয়ে এখানে এনেছেন, তাকাতে লাগলো সে এদিক-সেদিক। ঠিক সেই মুহূর্তে কাপালিক তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে যুবরাজ সমীর সেনকে চারিপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেললো। তখন সমীর বুঝতে পারলো কেন তার পিতা তাকে এখানে এনেছিলেন......

থামলো বৃদ্ধ ভিখারী, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে তার।

বনহুর অধীর আগ্রহ নিয়ে শুনছে তার কথাগুলো। কারাকক্ষের নিস্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধে উঠলো ক্ষণিকের জন্য।

বৃদ্ধ বলতে শুরু করলো—সমীরকে হাত-পা-মুখ বেঁধে কালীমার সম্মুখে নেওয়া হলো......না না, তারপর আর কিছু আমি জানি না...জানি না......

বনহুর এবার বৃদ্ধ ভিখারীর জামার আস্তিন চেপে ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললো— বলো কে সেই মহারাজ হীরন্ময় যে নিজের প্রাণের বিনিময়ে যুবক পুত্রকে বিসর্জন দিতে পারে? কে সেই নিষ্ঠুর পিতা? কোথায় আছে সে বলো?

না না, ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, সেই নিষ্ঠুর পাষন্ড পিতার পরিচয় আমি জানি না। শুধু জানি, সে নীলদ্বীপের মহারাজ হীরন্ময়।

তোমাকে বলতেই হবে।

বলবো না, বলবো না আমি কোথায় আছে সে।

তুমি লুকোতে চেষ্টা করলে পারবে না বৃদ্ধ, আমি জানি তুমিই সেই নিষ্ঠুর পিতা হীরন্ময় সেনগুপ্ত......

আমি!

হাঁ তুমি।

বৎস, তুমি আমাকে হত্যা করো, আমি মহাপাপী, মহাপাতকী......

হত্যা করার পূর্বে তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে।

আমাকে তোমার প্রয়োজন?

হাঁ, তোমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে। মহারাজ তুমি এত নিষ্ঠুর! যুবক পুত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার ভবিষ্যৎ মুছে দিয়ে তুমি নিজে আজও পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে ফিরছো? তোমার হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই মনে হচ্ছে।

তিরস্কার করো, তুমি তিরস্কার করো আমাকে। নীল দ্বীপের মহারাজ আমি নই, আমি নীল দ্বীপের অভিশাপ। তাইতো আজ আমি রাজ্য ছেড়ে, পরিজন ত্যাগ করে ভিখারী হয়েছি। হাঁ, এখনও বহু কথা তোমাকে বলা হয়নি—সব শোনো, তারপর তুমি আমাকে হত্যা করো। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো ভিখারী বেশী মহারাজ হীরন্ময় সেন গুপ্ত—চোখের সম্মুখে পুত্রের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড দেখলাম...নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারলাম না...আক্রমণ করলাম আমি কাপালিক জয়দেবকে...কিন্তু

করার জন্য খর্গ উদ্যত করলো...তখন আমি চোখে মৃত্যু বিভীষিকাময় অন্ধকার দেখলাম...এই জীবন রক্ষার জন্য কত অসহায় প্রাণ তুই বিনষ্ট করেছিস তবু তোকে মরতে হলো? নিজের পুত্রকে তুই বিসর্জন দিলি—এই কি তার প্রতিদান? মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠলো...ভাবলাম, না না, এভাবে মরবো না...প্রতিশোধ নিতে হবে...প্রতিশোধ...বৃদ্ধ মহারাজ হীরন্ময় সেনগুপ্তের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো, অধর দংশন করতে লাগলেন তিনি।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে বৃদ্ধের মুখোভাবে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলো। বৃদ্ধের হৃদয়ের অভূতপূর্ব অনুভূতি অনুভব করছিলো সে অন্তর দিয়ে।

বৃদ্ধ মহারাজ আবার বলতে লাগলেন—আমার মন বললো...এই শয়তান কাপালিক যদি তোকে হত্যা করে তাহলে প্রতিশোধ নেবার কেউ থাকবে না। সে দিনের পর দিন আরও শত শত নিষ্পাপ প্রাণ বধ করে চলবে। তা হয় না, তোকে বাঁচতে হবে, ওকে নিঃশেষ করতে হবে...আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, আমি কাপালিক জয়দেবের পা জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাকে মেরো না, আমি শপথ করছি তোমার বলির জন্য প্রতি মাসে একটি করে যুবক দেবো, যেমন আমার পুত্র সমীর সেনকে দিয়েছি...আমার সেই কথায় খুশিতে কাপালিক জয়দেবের চোখ নেচে উঠলো। আমাকে বললো সে, কালীমায়ের পা স্পর্শ করে শপথ কর্ নাহলে আমি তোকে ক্ষমা করবো না। আমি মা কালীর পা স্পর্শ করে শপথ করলাম—মুখে বললাম, প্রতি মাসে একটি করে যুবক তোমার বলিদানের জন্য দেবো, কিন্তু মনে মনে বললাম, মা আমাকে ক্ষমা করিস্, আমি তোর পা স্পর্শ করে মিথ্যা কথা বললাম। আমি জয়দেবকে বলি দেবো তোর পায়ে...আমি ছাড়া পেলাম, তারপর থেকে জয়দেবকে হত্যা করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলাম। একদিন সুযোগ এলো...জয়দেব তার মন্দিরে পূজা করে চলেছে, এমন সময় আমি হাজির হলাম সেই মন্দিরে। আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। আড়াল থেকে দেখলাম কাপালিক জয়দেব পূজা করছে, তার পাশেই পড়ে রয়েছে সুতীক্ষ্ণ ধার খর্গ। চোখ দুটো আমার জ্বলে উঠলো, একটা বিপুল খুনের নেশা আমাকে পেয়ে বসলো। আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। সুযোগ এলো, জয়দেব পূজা শেষ করে যেমন সে মাথাটা মাটিতে রেখে দেবীকে প্রণাম করতে গেলো অমনি আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে খর্গটা তুলে নিলাম হাতে, মুহূর্ত বিলম্ব না করে খর্গের এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললাম কাপালিক জয়দেবের দেহ থেকে মাথাটা। উঃ! সে কি ভীষণ রক্তস্রোত।

আমি আরষ্ট হয়ে গেলাম। ঠিক ঐ সময় সহসা এক ভয়ঙ্করী নারীমূর্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো......

নারীমূর্তি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর।

হাঁ, সে এক প্রেতমূর্তি যেন। আমার চুল বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কাপালিক আমাকে ধরে ফেললো দৃঢ়হস্তে। নারীমূর্তিকে আমার চিনতে দেরী হলো না, সে জয়দেবের কন্যা যোগিনী নীলা। পিতার চেয়েও ভয়ঙ্করী এই যোগিনী, রাক্ষুসীর মত তার কার্যকলাপ। এই যোগিনীকে নীলদ্বীপের রাণী বলে ওরা। আমি জয়দেবকে হত্যা করলাম বটে কিন্তু যোগিনী নীলার হাত থেকে নিস্তার পেলাম না। আমাকে সে অঙ্গীকার করালো সপ্তাহে একটি করে যুবক দিতে হবে বলির জন্য। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন রক্ষা পেলাম সেদিন, কিন্তু পরিত্রাণ পেলাম না, এক এক করে আমার চার পুত্রকে সঁপে দিতে হয়েছে সেই রাক্ষুসী যোগিনী নীলদ্বীপের রাণীর হাতে। পাঁচ পুত্রকে বিসর্জন দিয়ে আমি ভিখারী হয়েছি, দেশ ত্যাগ করেছি, রাজ্যের মায়া ত্যাগ করেছি, আত্মীয়-পরিজনকে ত্যাগ করেছি কিন্তু পরিত্রাণ পাইনি সেই নর-রাক্ষুসীর হাত থেকে......হাঁ, এবার আমি পরিত্রাণ পাবো। আমি জানি, একমাত্র দস্যু বনহুরই পারবে সেই নর-রাক্ষুসীকে কাবু করতে। তাই—তাই আমি খুঁজে ফিরছিলাম তাকে। পেয়েছি, পেয়েছি আমি......মহারাজ হীরন্ময় উন্মাদের মত চেপে ধরলেন বনহুরের জামাটা—কথা দাও, তুমি সেই নর-রাক্ষুসী পিশাচিনী নীল দ্বীপের রাণীকে ধ্বংস করবে? বলো, বলো, কথা দাও আমাকে?

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে যেন কোনো রূপকথার কাহিনী শুনছিলো। এবার সম্বিৎ ফিরে আসে তার, হীরন্ময় সেনের মুখে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলে—কথা দিলাম, তোমার পাঁচ পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবো।

সত্যি, সত্যি বলছো যুবক?

হাঁ, সত্যি বলছি।

কিন্তু তোমার যদি কোনো বিপদ হয়?

এক টুকরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে, বললো সে— দস্যু বনহুর কোনো বিপদে পিছপা হয় না মহারাজ।

আমি তা জানি, আর জানি বলেই তো তোমাকে খুঁজে ফিরছিলাম। কত জায়গায় তোমার সন্ধানে ফিরেছি, যেখানেই শুনেছি তোমার নাম সেখানেই

ছুটে গেছি কিন্তু কোথাও তোমার দেখা পাইনি। ভগবান আমার ডাক শুনেছিলেন, তাই আজ তোমাকে পেয়েছি......

বনহুর বললো— মহারাজ, আপনাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার জন্য আমি লজ্জিত, মাফ করবেন।

না না, তুমি আমার সন্তানের মত। সন্তান পিতাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করে থাকে।

বেশ, আমাকে সন্তান বলেই মনে করবেন। এবার আপনি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে আপনার সঙ্গে আমার নিভৃতে আলাপ আছে।

বনহুর করতালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে রহমান এবং জমশেদ আলী কারাকক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর বললো—তাঁকে কারাকক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যাও এবং ভাল খাবার দাও এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

বনহুরের আদেশমত বন্দী ভিখারী-বেশী নীলদ্বীপের মহারাজ হীরন্ময় সেনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। তাঁর বিশ্রাম এবং ভক্ষণের সুব্যবস্থা করা হলো।

❑

দস্যু বনহুর ভীল যুবকের বেশে সজ্জিত হয়ে মহারাজ হীরন্ময় সেনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তাকে হঠাৎ চিনে উঠতে না পেরে অবাক হলেন মহারাজ, বললেন—কে তুমি, কি চাও আমার কাছে?

বনহুর হেসে বললো—আমি বনহুর!

বনহুর! দস্যু বনহুর তুমি?

হাঁ মহারাজ। বলুন এখন আমাকে আপনার সঙ্গে নিতে কোনো অসুবিধা আছে?

না। কিন্তু......কিন্তু......

বলুন— কিন্তু কি?

সেই নর-রাক্ষুসী যোগিনী তোমাকে যদি সত্যিই হত্যা করে বসে? তাহলে আমার সব আশা-ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রতিশোধ আর কোনোদিনই......

হাসলো বনহুর, সে হাসির মধ্যে ফুটে উঠে এক বৈচিত্র্যময় ভাবধারা। বললো সে—সেজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই মহারাজ।

হীরন্ময় সেন গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

বনহুর বললো—আপনি প্রতিবারের মতই আমাকে নিয়ে উপস্থিত হবেন নীল দ্বীপে, তারপর সেই জয়দেবের কালী মন্দিরে। আমাকে তুলে দেবেন নীলা যোগিনীর হাতে......

এ সর্বনাশ আমি করতে পারবো না।

নিজ পুত্রকে আপনি কি করে তবে তুলে দিয়েছেন সেই নর-শয়তান কাপালিকের হাতে?

তখন আমার জীবনের প্রতি ছিলো এক মহাশক্তিময় আকর্ষণ—আজ আর সে আকর্ষণ নেই, মৃত্যুভয়ে ভীত আর নই আমি। শুধু চাই প্রতিশোধ, জয়দেবকে আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি, তার যোগিনী কন্যাকে এবার হত্যা করতে চাই। বনহুর, শুধু তাই নয়, ধ্বংস করতে চাই সেই নর-রাক্ষুসী যোগিনী নীলদ্বীপের রাণীর আখড়া নীল জঙ্গল, সেই কালী মন্দির, তার দলবল......

আপনার বাসনা পূর্ণ হবে মহারাজ। আমি যা বলবো সেইভাবে কাজ করবেন।

❑

রায়হান বন্দর থেকে ভিখারী বেশী মহারাজ হীরন্ময় সেন এবং ভীল যুবক-বেশী দস্যু বনহুর জাহাজে উঠে বসলো।

তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর জাহাজটি নীলদ্বীপে এসে পৌঁছলো।

ভিখারী-বেশী মহারাজের সঙ্গে বনহুর নেমে পড়লো নীলদ্বীপ বন্দরে।

নীলদ্বীপের নাম বনহুর শুনেছিলো, আজ সেই নীলদ্বীপে আগমন করে মনে মনে খুশি হলো সে। নীলদ্বীপ নীলই বটে, সুন্দর ছবির মত দ্বীপটা। সবুজ বনানী ঢাকা উঁচুনীচু জায়গা, মাঝে মাঝে উচ্চ অট্টালিকা। প্রশস্ত রাজপথ, পথের দু'পাশে নানারকম দোকানপাট। দ্বীপের পূর্বদিকে ঘন জঙ্গল, ওটাই হলো নীল দ্বীপের নীল জঙ্গল।

ভিখারীর সঙ্গে ভীল যুবক পথ চলছিলো।

ভিখারী আংগুল তুলে দেখালো—ঐ সেই নীল জঙ্গল। ওখানেই আছে নীল দ্বীপের রাণী নীলা।

ভীল যুবকের চোখ দুটো শুধু চকচক্ করে উঠলো, কোনো জবাব দিলো না সে।

পথ চলেছে ওরা দু'জন।

বনহুরের মাথায় তখন একরাশ চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো......কিভাবে সে কাজ শুরু করবে...প্রথমে কোনো এক স্থানে আশ্রয় নিতে হবে, তারপর গোপনে সন্ধান নিতে হবে সেই নর-রাক্ষুসী যোগিনীর। অতঃপর মহারাজ হীরন্ময়ের সঙ্গে প্রকাশ্য বলিদানের জন্য হাজির হতে হবে কাপালিক জয়দেবের সেই কালীমন্দিরে......

পথ চলতে চলতে বড় হাঁপিয়ে পড়েছিলো মহারাজ হীরন্ময় সেন। বনহুর তাঁকে বললো—মহারাজ, চলুন ঐ গাছের নিচে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।

মহারাজ হীরন্ময় খুশি হয়ে বললেন—তাই চলো বাবা।

মহারাজ, এরপর থেকে আপনি আমাকে 'বৎস' বলেই ডাকবেন—আর আমি আপনাকে ডাকবো 'গুরুদেব' বলে।

হাঁ, সেই ভাল।

উভয়ে এসে বসলো পথের ধারে একটা গাছের নিচে। শীতল ছায়ায় দেহের ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো অল্পক্ষণে। ভীল যুবকবেশী দস্যু বনহুর বললো—গুরুদেব, এখন সর্বপ্রথম রাজ প্রাসাদেই আপনাকে যেতে হবে। কারণ সেখানে আপনাকে দুদিন অপেক্ষা করতে হবে, অমাবস্যার দুদিন বাকি আছে।

হাঁ বৎস, তুমি ঠিকই বলেছো। অমাবস্যা রাতে সোজা তোমাকে নিয়ে হাজির হবো নীল জঙ্গলে।

গুরুদেব!

বলো?

রাজপ্রাসাদে আপনি নিজ পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করবেন। পারবেন কি সক্ষম হতে?

সকলের চোখে ধূলো দিয়ে নিজে অতিথি হিসেবে থাকতে পারবো কিন্তু একজনের কাছে পারবো না আত্মগোপন করতে, সে হলো আমার একমাত্র কন্যা বিজয়ার কাছে।

বিজয়া!

হাঁ, আমার পাঁচপুত্র এবং এক কন্যা ছিলো। পাঁচ পুত্রকে বিসর্জন দিয়েছি, শুধু একমাত্র কন্যা বিজয়া মা আমার রাজপ্রাসাদ আলো করে আছে। জানি না তার ভাগ্যে কি আছে! হীরন্ময় সেনের গণ্ড বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে তার সম্মুখে মাটিতে একটি তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো। চমকে উঠলো বনহুর, তীরফলকটি হাতে তুলে নিতেই দেখতে পেলো তাতে বাঁধা রয়েছে একখানা ভাঁজ করা কাগজ। কাগজখানা দ্রুতহস্তে খুলে সর্বপ্রথম কাগজের নিচে তাকালো বনহুর, দেখলো লেখা আছে—"আশা"। নীলদ্বীপে আশা এলো কি করে! বনহুরের মনে বিস্ময় জাগলো। এবার সে চিঠিখানা পড়লো—

"বনহুর, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে
কাজ করবে। তোমার উপর নির্ভর
করছে নীলদ্বীপের ভবিষ্যৎ। আমি
তোমার সঙ্গে আছি।"

—আশা

বনহুর যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, আশা তাকে অনুসরণ করে নীলদ্বীপেও এসেছে! অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করলো—আশ্চর্য!

এতক্ষণ হীরন্ময় সেন অবাক হয়ে বনহুরের হাতের চিঠিখানা লক্ষ্য করছিলেন এবং মনে মনে ভীত হয়ে উঠছিলেন, এবার বললেন তিনি—কার এ চিঠি বৎস?

বনহুর বললো—পড়ে দেখুন গুরুদেব?

চিঠিখানা দিলো বনহুর মহারাজ হীরন্ময় সেনের হাতে।

হীরন্ময় সেন চিঠিখানা পড়ে বললেন—আশা! কে এই আশা?

আমিও জানি না কে এই নারী যে আমাকে অনুসরণ করে নীলদ্বীপ পর্যন্ত এসেছে।

হীরন্ময় বললেন—আশ্চর্য বটে!

বনহুর তখন গভীরভাবে ভেবে চলেছে......আশার উদ্দেশ্য কি? কেনই বা সে তাকে এমনভাবে অনুসরণ করে। কেনই বা তাকে রক্ষার জন্য এত তার আগ্রহ? আর কেনই বা সে নিজকে এভাবে গোপন করে রাখে......ভেবে কিছু স্থির করতে পারে না। উঠে পড়ে বনহুর আর হীরন্ময় সেন।

আবার তারা পথ চলতে শুরু করে।

নীলদ্বীপের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে বনহুরকে।

বহুক্ষণ চলার পর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয় তারা।

মহারাজ হীরন্ময় তার অংগুরী দেখাতেই প্রহরী পথ মুক্ত করে দেয়। হীরন্ময় প্রাসাদে প্রবেশ করেন, সঙ্গে তার ভীল যুবক-বেশী দস্যু বনহুর। অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার পূর্বে ভিখারীর পোশাক পরিবর্তন করে ফেলেন মহারাজ হীরন্ময়!

মহারাজ ফিরে এসেছেন শুনে ছুটে আসেন মহারাণী মাধবী দেবী এবং কন্যা বিজয়া।

মহারাজ প্রায় ছ'মাস পূর্বে প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন, আজ তিনি ফিরে এসেছেন, এ যে পরম সৌভাগ্য। প্রাসাদে আনন্দের বান বয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু কেউ খুশি হতে পারলেন না, কারণ মহারাজ শাপগ্রস্ত। তাঁর পাঁচ সন্তানকে বলি দান করেছেন তবু তিনি শাপমুক্ত হতে পারেননি, ভিখারীর বেশে তাঁকে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, সংগ্রহ করতে হচ্ছে কাপালিক জয়দেবের মন্দিরের নরবলির জন্য নিষ্পাপ যুবকগণকে।

মহারাণী মাধবী দেবী এবং রাজকন্যা বিজয়া পিতার সঙ্গে এক ভীল যুবককে দেখে শিউরে উঠলো, না জানি কে এই যুবক।

মহারাণী এবং রাজকন্যা করুণার চোখে ভীল যুবকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। মহারাজ বললো—রাজপ্রাসাদে এর থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

মহারাজের কথামত ভীল যুবক-বেশী বনহুরকে রাজপ্রাসাদে থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

মহারাজ হীরন্ময় সেন অন্তপুরে তাঁর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতেই মহারাণী মাধবী দেবী স্বামীর সম্মুখে এসে অশ্রুভরা চোখে বললেন—একি করছো তুমি? নিজ পুত্রদের বিসর্জন দিয়েও তোমার সাধ মেটেনি? কি হবে রাজ্য নিয়ে, কি হবে আর এ তুচ্ছ জীবন বাঁচিয়ে? পারবে না তুমি আর কোনো নিষ্পাপ জীবন হত্যা করতে। ঐ ভীল যুবককে তুমি মুক্তি দাও।

মহারাজ এবং মহারাণী যখন অন্তপুরে এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন বিজয়া এসে দাঁড়ায় ভীল যুবকের কক্ষে।

চমকে উঠে ভীল যুবক, সে কেবলমাত্র তার শয্যায় শয়ন করতে যাচ্ছিলো, ফিরে তাকিয়ে সোজা হয়ে বললো—আপনি!

হাঁ, আমি রাজকন্যা বিজয়া। ভীল যুবক, তুমি জানো না তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?

ভীল যুবকের দু'চোখে প্রশ্নভরা দৃষ্টি ফুটে উঠে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় সে বিজয়ার দিকে।

বিজয়া কক্ষের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে—শীগগীর তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। একটি দিন তুমি এই নীলদ্বীপে থাকবে না।

ভীল যুবক বলে উঠলো—আমার কেউ নেই রাজকুমারী। আমি বড় অসহায়, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

বিজয়া সরে আসে আরও, বললো—ভীল যুবক, এই রাজপ্রাসাদ তোমার জন্য নিরাপদ নয়। তুমি যত শীঘ্র পারো পালিয়ে যাও।

কোথায় যাবো আপনিই বলে দিন রাজকুমারী?

রাজকুমারী বিজয়ার দু'চোখে করুণা ঝরে পড়ে, সেও চিন্তিত হয়ে পড়ে। সত্যি লোকটা বড় অসহায়, যাবেই বা কোথায়! বিজয়া নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে ভীল যুবকের মুখের দিকে। ওর প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চিত কেশ রাশি, কানে বালা, গভীর নীল দুটি চোখ। বিজয়ার কাছে বড় ভাল লাগে ওকে। বড় মায়া হয়, কিন্তু কি করে উদ্ধার করবে ওকে ভেবে পায় না। তার পিতা ওকে যে বলি দেওয়ার জন্য এনেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে বিজয়া—তোমাকে আমি আমার গোপনকক্ষে লুকিয়ে রাখবো। তুমি নিরাপদে থাকবে সেখানে। অমাবস্যা রাত কেটে গেলে তুমি চলে যেও।

ভীল যুবক বললো—অমাবস্যা রাত কেটে গেলে আমি কোথায় যাবো? আপনার পিতা আমাকে একটা কাজ দেবেন বলে এনেছেন।

রাজকুমারী বেশ বিপদে পড়লো, ওকে যতই বুঝাতে চেষ্টা করে সে একেবারে কিছু বুঝতেই চায় না।

শেষ পর্যন্ত বিজয়া বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো অন্তপুরে।

রাত্রির অন্ধকার তখন রাজপ্রাসাদে নববধূর মত ঘোমটা টেনে দিয়েছে। প্রাসাদের লোকজন সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। মহারাণী সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে উঠানে তুলসী মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন।

রাজকন্যা বিজয়া পিতার কক্ষে প্রবেশ করলো।

বিজয়া যখন রাজকক্ষে প্রবেশ করে পিতার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন ভীল যুবক সকলের অলক্ষ্যে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতলো। শুনতে পেলো সে বিজয়ার ব্যাকুল কণ্ঠ—বাবা, তুমি ঐ ভীল যুবকটিকে হত্যা করো না, ওকে তুমি কাপালিক কন্যা যোগিনী নীলার হাতে তুলে দিও না। বলো বাবা, বলো তুমি মানবে আমার কথা?

বৃদ্ধ মহারাজের কণ্ঠস্বর—মা, আমি যে নিরুপায়।

বাবা, ওকে তুমি মুক্তি দিয়ে আমাকে তুলে দাও যোগিনীর হাতে। আমাকে তুমি হত্যা করো বাবা, আমাকে তুমি হত্যা করো......

আমি কি নিয়ে বাঁচবো মা, তোকে হারিয়ে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো বল্? সব হারিয়েছি, পাঁচ পুত্রকে আমি দেবীর পায়ে বলি দিয়েছি......না না, পারবো না আমি তোকে হারাতে।

বাবা, আমিও তোমাকে দেবো না ঐ ভীল যুবকটিকে হত্যা করতে। নিষ্পাপ সুন্দর একটি জীবন—বাবা, তোমার পায়ে ধরি তুমি ওকে হত্যা করো না।

মা, আমি যে অভিশাপগ্রস্ত, আমাকে প্রতি অমাবস্যায় একটি করে যুবক সংগ্রহ করে দিতেই হবে, নাহলে......

বলো, নাহলে কি হবে?

সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হবে, আমার অসংখ্য প্রজাদের প্রাণ বিনাশ হবে। আমাকেও ওরা হত্যা করবে........

বাবা!

হাঁ মা, সেই ভয়ঙ্কর নীলা তার পিতা জয়দেবের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। তার আয়েত্তে আছে সাতজন ভয়ঙ্কর নর-রাক্ষস কাপালিক, যাদের শক্তির কোনো তুলনা হয় না।

কক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে কারও পদশব্দ। রাণী সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা শেষ করে ফিরে আসছেন হয়তো। ভীল যুবক দ্রুত ফিরে গেলো তার নির্দিষ্ট কক্ষে।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে চমকে উঠলো ভীল যুবক। সে দেখলো, তার বিছানায় একটি তীরবিদ্ধ হয়ে আছে। কক্ষের চারিদিকে তাকালো সে, একপাশে মোমদানিতে মোটা একটি মোম জ্বলছে। কক্ষশূন্য, একটা থমথমে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে কক্ষের চারিদিকে। ভীল যুবক বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো, তীরটি তুলে নিলো হাতে। দেখলো সে, তীর ফলকে গাঁথা আছে একটি ভাঁজ করা চিঠি। ভীল যুবক তীরফলক থেকে চিঠিখানা খুলে নিলো তারপর এগিয়ে গেলো মোমদানির দিকে। চিঠিখানা মেলে ধরতেই অবাক হলো সে, রাজ প্রাসাদেও এসেছে আশা! আশ্চর্য এই নারী। চিঠিখানা পড়তে লাগলো ভীল যুবক—

"বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছো বনহুর,
সহজে তুমি মুক্তি পাবে না এখান থেকে
কিন্তু তোমার সম্মুখে এক মহান কর্তব্য
রয়েছে। জানি তুমি কর্তব্য পালনে
কোনোদিনই বিমুখ নও। আমি তোমার
মঙ্গল কামনা করি।

—আশা

ভীল যুবকের মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসির রেখা, চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে শয্যা গ্রহণ করলো। ভাবতে লাগলো আশার কথা...কে এই নারী যে তার পিছনে ছায়ার মত বিচরণ করে ফিরছে অথচ তাকে সে আজও আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো না। সারাদিন হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, বেশিক্ষণ কিছু ভাবতে পারে না, দু'চোখ তার মুদে আসে, নিদ্রায় ঢলে পড়ে সে।

রাজপ্রাসাদ নিস্তব্ধ।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাইরে শোনা যায় প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ খট খট খট।

আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বলছে।

মহারাজ তার নিজ কক্ষে নিদ্রামগ্ন। বৃদ্ধ মানুষ, তারপর বহু হেঁটেছেন তিনি আজ।

হঠাৎ ভীল যুবকের ঘরের দরজা খুলে যায়, আপাদমস্তক কালো আবরণে ঢাকা এক নারীমূর্তি প্রবেশ করে সেই কক্ষে, এগিয়ে যায় শয্যায় শায়িত ভীল যুবকটির দিকে। নির্বাক দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে নিদ্রিত ভীল যুবকের মুখে। বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে অপলক নয়নে যুবকের দিকে. অতঃপর লঘু হস্তে চাদরখানা টেনে দেয় তার দেহের উপর। আলগোছে একটা চিঠি রেখে দেয় সে ভীল যুবকের বালিশের পাশে।

যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে যায় আলখেল্লা পরিহিতা নারীমূর্তি।

সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেলো ভীল যুবকের. ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলো. কারণ তার ঘুমাবার সময় নয় এটা। চোখ রগড়ে তাকালো মোমবাতিটার দিকে। মোমবাতি দেখে সে বুঝতে পারলো বহুক্ষণ ঘুমিয়েছে— মোমবাতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো ভীল যুবক তার দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেলো বিছানায় বালিশটার পাশে। একি! চিঠি কার? কেউ কি তবে এ কক্ষে প্রবেশ করেছিলো? দ্রুতহস্তে চিঠিখানা নিয়ে সরে এলো মোমবাতিটার পাশে, চিঠিতে মাত্র দু'লাইন লিখা—

> বনহুর, প্রাণভরে তোমাকে
> দেখলাম। এমন করে কোনোদিন
> তোমাকে দেখিনি। হাঁ, আমি
> তোমার পাশেই আছি, থাকবো
> চিরদিন।
>
> —আশা

বনহুরের মুখ গম্ভীর হয়ে পড়লো, অধর দংশন করে আপন মনে বললো, একটা নারীর কাছে তার এরকম পরাজয়! পরাজয় নয়তো কি? যে নারী তার পাশে পাশে অহরহ ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে সে ধরতে পারে না, দেখতে পারে না— কে সে? কি তার পরিচয়? বনহুর পায়চারী করতে লাগলো। কিন্তু এখন আশার কথা ভাববার সময় নেই, অনেক কাজ তার বাকি রয়েছে, নীল দ্বীপের গভীর রহস্য নীল রাণীকে তার জানতে হবে।

বনহুর রাজপ্রাসাদ থেকে বের হবার উপায় চিন্তা করতে লাগলো। বেরিয়ে এলো সে কক্ষ থেকে, অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো প্রাসাদের পিছন প্রাচীরের দিকে। সুউচ্চ প্রাচীর বলে এদিকে তেমন কোনো পাহারা নেই। বনহুর অতি সহজেই প্রাচীর টপকে বেরিয়ে এলো প্রাসাদের বাইরে। প্রাসাদের অদূরেই অশ্বশালা। বনহুর অশ্বশালায় প্রবেশ করে বেছে নিলো একটি বলিষ্ঠ সবলদেহী অশ্ব।

অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো বনহুর।

উল্কা বেগে অশ্ব ছুটতে শুরু করলো।

তারাভরা আকাশ।

আকাশে চাঁদ না থাকলেও তারার আলোতে পৃথিবীটা বেশ স্বচ্ছ মনে হচ্ছিলো। বনহুরের অশ্ব তীরবেগে ছুটে চললো নীল জঙ্গল অভিমুখে।

❑

রাত ভোর হবার পূর্বেই ফিরে এলো বনহুর। অশ্বশালায় অশ্ব বেঁধে রেখে রাজপ্রাসাদের প্রাচীর টপকে অন্তপুরে প্রবেশ করলো সে, নিজ কক্ষে প্রবেশ করে চাদর টেনে শুয়ে পড়লো।

খুব ভোরে রাজকন্যা বিজয়া বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিলো। পিতার পূজার জন্য সে নিজ হাতে বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করতো। ফুল নিয়ে ফেরার পথে হঠাৎ মনে পড়লো ভীল যুবকের কথা। ধীর পদক্ষেপে বিজয়া প্রবেশ করলো ভীল যুবকের কক্ষে।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো বিজয়া, মুক্ত জানালার পাশে শয্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন ভীল যুবক। ভোরের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে ভীল যুবকের মুখে।

বিজয়া সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না, নির্ণিমেশ নয়নে সে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ভেবে পায় না বিজয়া ভীল জাতির মধ্যেও এত সুন্দর হতে পারে! নিজের অজান্তে এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে রাখলো ভীল যুবকের উপর তারপর লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ পাশের একটা পাত্রে পা লেগে শব্দ হয়।

ঘুম ভেঙ্গে যায় ভীল যুবকের, চমকে উঠে বসে দেখতে পায় রাজকুমারী বিজয়া কক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে। তার হাতের ফুলের সাজিতে অনেক ফুল। ভীল যুবক নিজের কোলের উপর কতকগুলো ফুল ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো। বুঝতে পারলো ফুলগুলো রাজকন্যা বিজয়ার উপহার। ভীল যুবক ফুলগুলো হাতে নিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরলো।

অস্ফূট কণ্ঠে বললো সে—হায় নারী, তোমরা ফুলের মতই সুন্দর আর কোমল আবার তোমরাই পাথরের চেয়েও শক্ত, নরকের চেয়েও ঘৃণ্য......

এমন সময় রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন।

দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো ভীল যুবক।

মহারাজ বললেন—বৎস, ঘুম হয়েছে তো?

হাঁ গুরুদেব, সমস্ত রাত্রি আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছি।

আজ দিবাগত রাত্রি শেষ হলে কাল অমাবস্যা, জানি না বৎস তোমার ভাগ্যে কি আছে।

আপনি চিন্তিত হবেন না গুরুদেব।

কি জানি বৎস, কেমন যেন দুর্বলতা বোধ করছি। মহারাণী এবং বিজয়া তোমাকে মুক্তি দেবার জন্য আমাকে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

আমি জানি তাঁরা কত মহৎ, কত মহাপ্রাণা।

কিন্তু কি করে তাঁদের আমি শান্ত করি বলো।

সে ভার আমি গ্রহণ করলাম গুরুদেব।

বেশ, আমি তাহলে পূজার জন্য চললাম।

আচ্ছা।

মহারাজ বেরিয়ে গেলেন।

ভীল যুবক মুক্ত জানালা দিয়ে তাকালো নীল আকাশের দিকে।

এমন সময় একটা দাসী এসে খাবার রেখে গেলো, যাবার সময় বললো—খাবারগুলো খেয়ে নাও। দেখো পেট পুরে খেয়ো।

ফিরে তাকালো ভীল যুবক, বৃদ্ধা দাসীর দরদভরা কথাগুলো তার কানে যেন সুধা বর্ষণ করলো। মুক্ত জানালা থেকে ফিরে এলো খাবার টেবিলটার পাশে। আলগোছে ঢাকনা তুলতেই চমকে উঠালা, খাবার প্লেটের পাশে একটা ভাঁজ করা কাগজ। ভীল যুবক খাবার না খেয়ে চিঠিখানা তুলে নিলো হাতে, মেলে ধরতেই তার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো—

> বৃদ্ধা দাসীর বেশে এসেছিলাম, ওমন
> করে নিশ্চুপ কি ভাবছিলে? কই,
> একটি কথাও তো বললে না? কিছু
> ভেবো না, সব সহজ হয়ে যাবে।
>
> —আশা

ভীল যুবক-বেশী বনহুর চিঠিখানা পড়া শেষ করে তাকালো দরজার দিকে, যে পথে একটু আগে চলে গেছে সেই বৃদ্ধা দাসী। এত কাছে এসেছিলো আশা অথচ তাকে সে ধরতে পারলো না। কী সুচতুরা এই নারী। ভীল যুবক মুহূর্ত বিলম্ব না করে, খাবার না খেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো, রাজ-অন্তপুরে এগিয়ে চললো।

মহারাজ ব্যস্ত হয়ে ভীল যুবকের কাছে এসে বললেন—কি হয়েছে বৎস?

ভীল যুবক বললো—এই মুহূর্তে আপনার প্রাসাদের সব দাস-দাসীদের আমার সম্মুখে হাজির করুন।

হঠাৎ এ কথা কেন বৎস? বললেন মহারাজ।

ভীল যুবক বললো—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বেশি প্রশ্ন না করে মহারাজ তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের সকল দাসদাসীকে হাজির করার জন্য আদেশ দিলেন।

অল্পক্ষণে প্রাসাদের সবগুলো দাসদাসীকে হাজির করা হলো। সবাইকে ভীল যুবক নিজে পরীক্ষা করে দেখলো, কিন্তু এরা সবাই সত্যিকারের দাসী, বহুদিন থেকেই এরা রাজপ্রাসাদে কাজ করে চলেছে। সেই বৃদ্ধা দাসীকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। বনহুর মনে মনে বেশ ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো। কিন্তু মুখোভাব ঠিক রেখে বললো—যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি মহারাজ, এবার এরা যেতে পারে।

মহারাজের নির্দেশে সবাই চলে গেলো।

ফিরে এলো ভীল যুবক নিজ কক্ষে।

প্রাতঃরাশ তার এখনও সমাধা হয়নি। কিছু পূর্বে বৃদ্ধা দাসী-বেশী আশার রেখে যাওয়া খাবার খেয়ে বসলো ভীল যুবক। বড় সুস্বাদু খাবারগুলো পেট পূর্ণ করে খেলো সে। খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছে হঠাৎ তার নজর পড়লো দরজার পাশে একটু আড়ালে পড়ে আছে একটি পরচুলা আর কাপড়-চোপড়। ভীল যুবক এগিয়ে গিয়ে সেগুলো বের করে আনতেই বুঝতে পারলো, ঐ পরচুলা এবং পোশাকই বৃদ্ধা দাসী-বেশী আশার। ভীল যুবক স্তব্ধ হয়ে রইলো, বুঝতে পারলো, সে যখন দাস-দাসীদের পরীক্ষা করে দেখছিলো তখন তারই কক্ষে আশা পোশাক পরিবর্তন করে নিয়েছে, কিন্তু সে গেলো কোথায়?

❑

আজ অমাবস্যা।

যোগিনী নীলা ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করেছে। নীল জঙ্গলের মন্দিরে আজ কাপালিকদের আড্ডা জমে উঠেছে। যোগিনী নীলার এলোকেশ ছড়িয়ে আছে তার সমস্ত পিঠে। কপালে রক্তের রেখা, গলায়-হাতে-বাজুতে রুদ্রাক্ষের মালা। কালীমূর্তির সম্মুখে ভীমাঙ্গিনীর মত বসে আছে, সামনে বিরাট অগ্নিকুণ্ড, পাশেই উচ্চ বেদীর উপর নরমুণ্ড রক্ষিত।

একজন কাপালিক মন্ত্র পাঠ করে চলেছে।

যোগিনী নীলার চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছে। সেকি ভীষণ ভয়ঙ্কর কঠিন এক নারীমূর্তি।

নীল জঙ্গল সেই মন্ত্র পাঠের সঙ্গে যেন দুলে দুলে উঠছে। জঙ্গলের পশু-পাখি সবাই আজ জঙ্গল ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে কে জানে। থমথমে জমাট রাত, মাঝে মাঝে হিমেল হাওয়া বইছে। গাছের পাতায় সা সা শব্দ হচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের কিছু কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু আজ আকাশে একটিও তারার চিহ্ন নেই।

অমাবস্যার রাত।

যোগিনী নীলা প্রতীক্ষা করছে, তার বলি এখনও এসে পৌঁছায়নি। অন্যান্য কাপালিক সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। মহারাজ হীরন্ময় সেন এখন পর্যন্ত এলো না, বলির লগ্ন যে এসে পড়লো বলে।

ওদিকে রাজবাড়িতে তখন বিজয়া পিতার পা দু'খানা চেপে ধরে বলছে—বাবা, তুমি যাই করো, ঐ ভীল যুবককে যোগিনী নীলার কাছে নিয়ে যেও না। সর্বনাশী রাক্ষুসী ওকে হত্যা করে ফেলবে।

মা, কোনো উপায় নেই। যোগিনী নীলা ওকে না পেলে শুধু আমাকেই হত্যা করবে না, আমার অগণিত নিরীহ প্রজাদের ধ্বংস করে ফেলবে। সমস্ত নীলদ্বীপ শ্মশানে পরিণত হবে।

মহারাণীও কন্যার সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বামীর কাছে মিনতি জানাচ্ছেন—ওগো, তুমি ঐ অসহায় ভীল যুবকটিকে হত্যার জন্য নিয়ে যেও না। ওকে বড় মায়া লাগছে, বড় মায়া লাগছে, জানি না কি মোহশক্তি আছে ওর মধ্যে। ওর দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে গেছি আমার হারানো পাঁচ সন্তানকে।

রাণী, আমি নিরুপায়। ওকে আজ নিয়ে যেতেই হবে সেই নীল জঙ্গলে। তোমরা বাধা দিও না আমাকে। বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। বলির সময় উত্তীর্ণ হলে কাপালিকা নীলা আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। না না, যেতে দাও, যেতে দাও রাণী......

বিজয়া আর মহারাণী যখন মহারাজকে গমনে বাধা দিচ্ছিলো তখন ভীল যুবক এসে দাঁড়ায় সেখানে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—গুরুদেব আসুন, কোথায় যেতে হবে বলেছিলেন?

মহারাজ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—চলো বৎস, চলো।

মহারাণী ভীল যুবকসহ বেরিয়ে পড়লেন, কোনো বাধাই তাদের ক্ষান্ত করতে পারলো না।

এগিয়ে চলেছেন মহারাজ হীরন্ময় সেন এবং ভীল যুবক। জমাট অন্ধকার রাত, পথঘাট তেমন করে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মহারাজ বললেন—একটা কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

হাঁ গুরুদেব, বললো ভীল যুবক।

কিসের শব্দ বলে তোমার মনে হয় বৎস?

অশ্বপদ শব্দ বলেই আমার ধারণা হচ্ছে। বহুদূর পথ দিয়ে কোনো অশ্বারোহী চলে গেলো।

এত রাতে অশ্বারোহী, কে সে, আর কোথাই বা যাচ্ছে সে?

মহারাজ. নিশ্চয়ই কোনো নিশাচর।

কিন্তু বৎস, আমার রাজ্যে প্রজাগণ কাপালিক জয়দেবের ভয়ে এমন ভীত যে, তারা সন্ধ্যার পর কেউ বাইরে বের হয় না বা বের হবার সাহস পায় না।

মহারাজ, এমন জনও হয়তো আছে যে কাপালিক ভয়ে ভীত নয়। তারই অশ্বপদ শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। অশ্বপদ শব্দ জঙ্গলের দিকেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

হাঁ, কেউ নীল জঙ্গল অভিমুখেই গমন করেছে বলে মনে হচ্ছে। বৎস. আমার কেমন যেন চিন্তা হচ্ছে।

চিন্তার কোনো কারণ নেই গুরুদেব। হয় জীবন রক্ষা পাবে নয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো......

না না. তাহলে আমার সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মহারাজ, ধৈর্যচ্যুত হবেন না। আজ রাত আপনার জীবনে এক মহা পরীক্ষার রাত। শুধু আজ রাতের উপর নির্ভর করছে আপনার নীল দ্বীপের ভবিষ্যৎ।

বনহুর, তুমিই আমার ভরসা!

মহারাজ. দয়াময় আল্লাহ আমাদের ভরসা। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল করবেন।

একসময় নীল জঙ্গলে পৌঁছে গেলেন মহারাজ আর ভীল যুবক। গহন জঙ্গলে অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো তারা। মহারাজ একটি মশাল জ্বেলে নিয়েছিলেন, তারই আলোতে পথ দেখে চললেন।

মাঝে মাঝে হাঁপাচ্ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজ হীরন্ময় সেন। কারণ এতটা পথ তাঁকে দ্রুতপায়ে আসতে হয়েছিলো।

বহুক্ষণ ধরে তাদের চলতে হয়েছে।

এক সময় একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে এলো তাদের।

কাপালিক ঠাকুরের মন্ত্রপাঠের আওয়াজ এটা। বনভূমি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিলো সে শব্দে।

মশালের আলোতে ভীল যুবক লক্ষ্য করছিলো, মহারাজের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, পা দু'খানা কাঁপছে তাঁর।

ভীল যুবক বললো—মহারাজ, আপনি বেশি ভীত হয়ে পড়েছেন।

বৎস, এমনিভাবে আমি আমার পাঁচটি রত্নকে এই বনে নিয়ে এসেছিলাম, কাউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। আজ জানি না ভাগ্যে কি আছে। তোমাকেও হারাবো কিনা কে জানে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। মৃত্যু একদিন হবেই, সেজন্য এত ভেবে বা উদ্বিগ্ন হয়ে কোনো লাভ নেই।

ক্রমেই মন্ত্রপাঠের শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো। মহারাজের পা দু'খানা যেন ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠছে যেন।

ভীল যুবক মহারাজকে ধরে ধরে নিয়ে চললো।

দূরে বনের মধ্য হতে দেখা যাচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা।

আরও কিছুটা অগ্রসর হতেই মন্দিরটা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। মহারাজ ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছেন। একসময় মন্দিরের নিকটে পৌঁছে গেলো তারা।

দু'জন কাপালিক মন্দিরের দরজায় খর্গ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলো, তারা মহারাজ হীরন্ময় সেনের সঙ্গে একটি ভীল যুবককে দেখে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে শংখধ্বনি করলো তারা।

তৎক্ষণাৎ মন্দিরের মধ্যে হতে বেরিয়ে এলো ভীষণকায় দু'জন কাপালিক। তাদের এক একজনকে এক একটি দৈত্যের মত মনে হচ্ছিলো। মাথায় জটাজুট, মুখে রাশিকৃত দাড়ি-গোঁফ। চোখগুলো যেন আগুনের গোলা।

কাপালিক দু'জন এসে ভীল যুবকটিকে ধরে ফেললো দৃঢ় মুষ্ঠিতে। দরজায় দণ্ডায়মান কাপালিকদ্বয় এসে ধরলো মহারাজ হীরন্ময়কে। একরকম টেনেই নিয়ে চললো তারা।

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করতেই যোগিনী নীলা ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠলো—তোমার স্পর্ধা তো কম নয় মহারাজ, বলির লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এত বিলম্ব হলো কেন?

মহারাজ হীরন্ময় সে করজোড়ে বললেন—বহুদূরের পথ, তাই আসতে বিলম্ব হয়েছে। ক্ষমা করো......

ভয়ঙ্করী রূপ নিয়ে হেসে উঠলো যোগিনী নীলা হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ......সে হাসি যেন থামতে চায় না। শয়তানী পিশাচিনীর হাসি। হাসি থামিয়ে বললো—এতদিন ক্ষমা করেছি কিন্তু আজ আর ক্ষমা নয়। আজ তোমাকেও মা কালীর চরণে বলি দেবো।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মহারাজ হীরন্ময় সেন, বললেন—তাই দাও, আমাকেও বলি দাও। আমি আর বাঁচতে চাই না।

যোগিনী বললো—হাঁ তাই হবে। প্রথমে মহারাজ পরে ঐ যুবকটিকে, কিন্তু বলির পূর্বে মা কালীর আরতি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একজন কাপালিক শঙ্খধ্বনি করলো।

মহারাজ এবং ভীল যুবক-বেশী বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো, মন্দিরের পিছন দরজা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলো অপ্সরীর মত একটি তরুণী। সমস্ত দেহে শুভ্র বসন, পায়ে নূপুর, গলায়-মাথায়-হাতে ফুলের মালা জড়ানো। মাথায় একটি পাতলা আবরণী, আবরণী দিয়ে তরুণীর মুখ ঢাকা। দু'হাতে তার দুটো ধূপ দানি। ধূপ দানি থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে ধুম্ররাশি ছড়িয়ে পড়ছে। তরুণী মন্দিরে প্রবেশ করে কালী মূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে মাথা নত করলো। তারপর নাচতে শুরু করলো সে। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নেচে চললো তরুণী। অদ্ভুত সে নৃত্য, আরতির লগ্নে কাপালিকগণ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তরুণী নর্তকীকে নৃত্যে উৎসাহ যোগাতে লাগলো।

মহারাজ শিউরে উঠেছেন—তিনি জানেন, নৃত্য শেষে তাহদের বলি দেওয়া হবে।

বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে ভীল যুবক তাকিয়ে ছিলো, নর্তকীর মুখমণ্ডল দেখবার জন্য তার মনে একটা বিপুল উৎসাহ জাগছিলো, কিন্তু দেখবার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ দু'জন বলিষ্ঠ কাপালিক তার দুটি বাহু বলিষ্ঠ হাতে মজবুত করে ধরেছিলো। মহারাজের অবস্থাও তাই, তাঁকেও দু'জন ধরে ছিলো শক্ত হাতে।

লেলিহান অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ঘুরেফিরে নর্তকী নৃত্য করে চলেছে। তার নূপুরের শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে বনভূমি।

যোগিনী নীলার চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

নৃত্যের তালে ধূপদানিগুলো রেখে দেবীর চরণতল থেকে তুলে নিলো সুরাপাত্র। দক্ষিণ হস্তে সুরা পাত্র, বাম হস্তে সুরাভাণ্ড। ভাণ্ড থেকে সুরা ঢেলে এগিয়ে ধরতে লাগলো সে এক এক জন কাপালিকের দিকে।

কাপালিকগণ নর্তকীর হাত হতে সুরাপাত্র নিয়ে ঢক ঢক করে সুরা পান করে চললো।

নর্তকী যোগিনী নীলার হাতেও একটা সুরাপাত্র তুলে দিলো।

প্রত্যেকটা কাপালিককে সুরা পান করালো নর্তকী, যোগিনী নীলাও সুরা পানে বিভোর হয়ে পড়লো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, কাপালিকগণ যে যেখানে ছিলো ঢলে পড়লো মন্দিরের মেঝেতে। যোগিনীর দেহটাও অগ্নিকুণ্ডের পাশে গড়িয়ে পড়লো।

নর্তকী দ্রুতহস্তে অগ্নিকুণ্ডের পাশ থেকে খর্গটা তুলে নিয়ে ছুড়ে দিলো ভীল যুবকের হাতে, সঙ্গে সঙ্গে বললো সে—মুহূর্ত বিলম্ব করো না, এদের প্রত্যেকের দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলো........

এবার বনহুর নিজ মূর্তি ধারণ করলো, খর্গ হাতে নিয়ে একটির পর একটি কাপালিকের দেহ থেকে মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে লাগলো। যোগিনী নীলাকেও হত্যা করলো, তার মাথাটা গড়িয়ে পড়লো অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

রক্তের স্রোত বয়ে চললো।

সবাইকে হত্যা করে ফিরে দাঁড়ালো বনহুর।

মহারাজ হীরন্ময় সেন বিস্মিত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। তিনি যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছেন। ভেবে পাচ্ছেন না কেমন করে কি হলো। এ সব কি স্বপ্ন না সত্য!

বনহুর মহারাজের দিকে তাকাতেই মনে পড়লো নর্তকীর কথা—কিন্তু কোথায় সে? বনহুর খেয়ালের উপর এতক্ষণ হত্যালীলা চালিয়ে চলেছিলো, ভাববার সময় ছিলো না কিছু—কে সে নর্তকী, কোথা হতেই বা হঠাৎ এলো আর সুরা পানেই বা কাপালিকগণকে কিভাবে জ্ঞানশূন্য করে ফেললো। যখন বনহুর নর্তকীর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তখন সে অদৃশ্য হয়েছে। বনহুর যা স্থির করে এখানে এসেছিলো , তা হয়নি। সে ভাবতেও পারেনি, এভাবে এত সহজে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে স্থির করেছিলো, কাপালিকরা যখন তাকে কালীর চরণে বলি দিতে উদ্যত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আত্মপ্রকাশ করবে এবং এক এক করে নীলা যোগিনী ও কাপালিকদেরকে শেষ করবে। অবশ্য মহারাজ হীরন্ময়ের কাছে সে শুনেছিলো, নীলা যোগিনীর মন্দিরে যে চারজন অসুরের মত শক্তিশালী কাপালিক আছে, তাদের ভয়ে নীলদ্বীপবাসী কম্পমান থাকতো এবং তাদের বিরোধিতা করার সাহস পেতো না। কিন্তু মহারাজ হীরন্ময় শুধু বনহুরকেই দেখেছিলেন, তার শক্তি প্রত্যক্ষ করেননি। বনহুর তার জীবনে ওরকম শক্তিশালী অনেক কাপালিককে শেষ করেছে। কিন্তু সেই শক্তি পরীক্ষার মুহূর্তটা আসেনি, কৌশলে নর্তকীটি কাজ সহজ করে দিয়েছে। বলতে গেলে বনহুরের করণীয় কাজ নর্তকীটি সমাধা করেছে। কিন্তু কে সেই নর্তকী? আর গেলোই বা কোথায়?

মহারাজও খেয়াল করেননি নর্তকী তরুণীটি গেলো কোথায়! হঠাৎ মহারাজের দৃষ্টি পড়লো তাঁর পায়ের কাছে, মেঝেতে পড়ে আছে একটি কাগজ। কাগজখানা তুলে নিয়ে তিনি বনহুরের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—দেখো দেখি বৎস, এটা কি?

বনহুর কাগজখানা মেলে ধরলো দ্রুত চোখের সামনে। কাগজখানায় লেখা আছে—

বিলম্ব করোনা বনহুর, মহারাজসহ
শীঘ্র ফিরে যাও রাজপ্রাসাদে।
আজ হতে মহারাজ শাপমুক্ত
হলেন। আমিই নর্তকীর বেশে
সুরার সঙ্গে বিষাক্ত ওষুধ মিশিয়ে
দিয়েছিলাম। যোগিনী নীলার
ধ্বংসই ছিলো আমার কামনা।
তুমি আমার কামনা পূর্ণ করেছো।

—আশা

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—মহারাজ, আশার বুদ্ধিবলে আজ আপনি শাপমুক্ত হলেন।

আশা! কে সেই আশা বলতে পারো বৎস?

আমিও জানি না কে সে!

নর্তকীর বেশে আমাদের সম্মুখে সে নৃত্য করেছে, এত কাছে ছিলো তবু আমরা তাকে চিনতে পারলাম না।

মহারাজ, এখন ভাববার সময় নেই, চলুন ফেরা যাক।

চলো বৎস, চলো। দাঁড়াও, একটু দেখে নেই—এই মন্দিরে মা কালীর চরণে আমার পাঁচ-পাঁচটি পুত্রকে অর্পণ করেছি। আজ তুমি যদি ওদের হত্যা না করতে তাহলে........

মহারাজ এবং বনহুর শুনতে পেলো সেই অশ্ব পদশব্দ। দূরে, অনেক দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে শব্দটা।

মহারাজ বললেন—পূর্বে যে অশ্বপদ শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয়েছিলো, এ সেই শব্দ না?

হাঁ, সেই শব্দ! আশার অশ্বের খুরের শব্দ এটা।

❑

নীল দ্বীপ আজ অভিশাপমুক্ত হয়েছে।

ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে সবাই। রাজ-প্রাসাদে মহা ধূমধাম চলেছে। যদিও রাজ প্রাসাদময় একটা গভীর শোকের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো, পাঁচ-পাঁচটি সন্তানকে হারিয়ে মহারাণীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিলো যেন। তিনি ভীল যুবক-বেশী বনহুরকে পেয়ে বুকে অসীম সান্ত্বনা

খুঁজে পেয়েছেন। এক মুহূর্ত তিনি ওকে কাছছাড়া করতে চান না। মহারাজের কাছে তিনি চেয়ে নিয়েছেন ওকে।

মহারাজ জানেন এ যুবকের আসল পরিচয় তবু শোকাতুরা স্ত্রীকে প্রবোধ দেবার জন্য কতকটা বাধ্য হয়েই ভীল যুবকটিকে তিনি তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন।

আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছে রাজপ্রাসাদ।

আজ কাঙ্গাল ভোজন করানো হবে। সমস্ত নীলদ্বীপের দীনহীন গরিব এসে জড়ো হচ্ছে রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে।

মহারাণী নিজ হস্তে কাঙ্গালদের দান করে চললেন। নিজ হাতে তিনি সবাইকে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করালেন। কন্যা বিজয়া মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে চললো।

নীলদ্বীপে ফিরে এসেছে অনাবিল শক্তি আর আনন্দ।

উৎসব চলেছে।

মহারাণী ধরে বসলেন ভীল যুবক তিলককে তিনি নিজ পুত্র হিসেবে অভিষেক করে গ্রহণ করতে চান।

বিপদে পড়লেন মহারাজ হীরন্ময় সেন, তিনি বললেন—একি কথা বলছো রাণী? একটা ভীল যুবককে তুমি অভিষেক করে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাও, সে কেমন কথা?

মহারাণী অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বামীকে বললেন—ভীল হলেও সে মানুষ। আমি ওর মধ্যে আমার হারানো সন্তানদের খুঁজে পেয়েছি। ও যেদিন আমাকে মা বলে প্রথম ডেকেছে, আমি ভুলে গেছি আমার সেই পাঁচ সন্তানকে...

রাণী!

হাঁ রাজা, আমি জানি না কেন ওকে আমার এত ভাল লেগেছে। ভীল যুবক হলেও ও মানুষ, আমার শরীরে যে রক্তের প্রবাহ ওর শরীরেও সেই রক্ত, কাজেই আমি ওকে ছেড়ে দেবো না আর......

মহারাজ আর মহারাণী মিলে যখন কথা হচ্ছিলো তখন আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে বনহুর। নতুন একটা সমস্যা তাকে যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলছে। বনহুরের মনেও জেগে উঠছে যেন একটি সন্তানসুলভ অনুভূতি। মহারাণীর কথাগুলো যেন তার বুকের মধ্যে একটির পর একটি গেঁথে যাচ্ছিলো। সন্তান হারিয়ে মায়ের সেকি ব্যথা, আজ বনহুর অন্তর দিয়ে অনুভব করলো।

বনহুর ফিরে গেলো নিজের ঘরে, একটা মায়ার বন্ধনে সে যেন আটকে পড়েছে। কি করে সে এই বন্ধন ছিন্ন করে বিদায় নেবে এই রাজপ্রাসাদ

থেকে? মহারাজ যখন এসে বলবেন তাকে মহারাণীর ইচ্ছার কথা তখন সে কিরূপে অমত করে বসবে—না না, তা হয় না। পালাতে হবে সকলের অলক্ষ্যে। বনহুর দ্রুতহস্তে একখানা চিঠি লিখলো মহারাজকে। তারপর পা টিপে টিপে কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটি কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বনহুরের কানে—তিলক।

বনহুর নীলদ্বীপে এই নামেই পরিচিত ছিলো, রাজপ্রাসাদেও সবাই তাকে তিলক বলে ডাকতো।

বনহুর চোরের মত চুপি চুপি সরে পড়তে যাচ্ছিলো, পালানো আর হলো না, ফিরে তাকালো সে। দেখলো, অদূরে সখী পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়া, চোখেমুখে তার আনন্দোচ্ছ্বাস। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো বিজয়া—তিলক, এসো আমাদের সঙ্গে আনন্দ উৎসবে যোগ দেবে।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে বাধ্য হলো রাজকন্যা বিজয়ার দিকে এগিয়ে আসতে।

বিজয়া সখীদের লক্ষ্য করে বললো—এই সেই ভীল যুবক তিলক, যে আমাদের নীলদ্বীপের অভিশাপ মোচন করেছে।

এতক্ষণ বনহুর লক্ষ্য করেনি সখীদের হাতে এক একটি ফুলের মালা, রাজকন্যা বিজয়ার হাতেও সুন্দর একটি মালা রয়েছে।

এগিয়ে আসে বিজয়া, প্রথমে সে-ই বনহুরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ার সখীরা এক এক করে মালা পরিয়ে দিলো বনহুরের গলায়।

স্তব্ধ বিস্ময়ে বনহুর তাকিয়ে আছে, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

একটি তরুণী বিজয়াকে লক্ষ্য করে বললো—ওকে কিন্তু ভীল যুবক বলে মনে হচ্ছে না।

আর একজন বলে উঠলো—সত্যি বলেছিস, ভীলরাতো জংলী, তাদের গায়ের রং কালো ভূতের মত হয়।

অন্য একজন বললো—একে তো রাজকুমার বলে মনে হচ্ছে!

বিজয়া হেসে বললো—রাজ কুমারই তো? জানিস না তোরা, মা ওকে আজ অভিষেক করে রাজকুমার হিসেবে গ্রহণ করবেন।

একসঙ্গে সখীরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

একজন বললো—বিজয়া, তুই বড় ভাগ্যবতী।

বিজয়া মৃদু হেসে বললে—চল্, ওদিকে আর সবাই হয়তো আমাদের খুঁজছে।

ওকে সঙ্গে নিবি না বিজয়া? বললো একজন।

বিজয়া তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

একরাশ মালার মধ্যে বনহুরের সম্পূর্ণগলা এবং চিবুকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো যেন। প্রাসাদের উজ্জ্বল আলোতে তাকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

বিজয়ার সখীরা সবাই মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলো ওর দিকে।

বিজয়া হেসে বললো—এসো আমাদের সঙ্গে।

বনহুর পালাতে চেয়েছিলো কিন্তু আরও বেশি করে আটকে পড়লো, অগত্যা বিজয়াকে অনুসরণ করলো সে।

সখীরা সবাই ওকে ঘিরে নিয়ে চললো।

বনহুর মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করতে লাগলো, একটা মজাব সৃষ্টি হলো এবার—বনহুর কিন্তু নীরবে এগিয়ে চলেছে, এতক্ষণেও সে কোনো কথা বলেনি।

সখীরা নানারকম আলাপ-সালাপ করছিলো, হাসছিলো ওরা বিজয়ার কানে কিছু বলাবলি করে।

বনহুর চলতে চলতে শুনতে পায় একজন ফিস্ ফিস্ করে বললো—ওকে কিন্তু ছেড়ে দিবি না বিজয়া, জয় করতেই হবে তোর।

বিজয়া একটু হেসে বললো—আমি ওকে জয় করতে পারবো কিনা জানি না, ও কিন্তু আমাকে জয় করে নিয়েছে।

সত্যি?

হাঁ।

বনহুর শুনলো সখীদের মধ্যে একটা হাঁসির হুল্লোড় উঠলো।

সবাই মিলে তখন বাগানের একটা সুন্দর নির্জন স্থানে এসে পৌঁছে গেছে। চারিদিকে নানারকম গাছপালা, মাঝখানে পানির হাউজ। হাউজের মধ্যে কতকগুলো পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। দুটো রাজহংসী সাঁতার কাটছিলো সেই হাইজে।

হাউজের চারপাশে শ্বেত পাথরের তৈরি আসন।

সখী পরিবেষ্টিত হয়ে বিজয়া আর তিলক এসে দাঁড়ালো সে স্থানে। গাছে গাছে আলোকমালা এবং নানারকম ফুলের ঝাড় ঝুলছে। সমস্ত রাজপ্রাসাদ জুড়ে একটা সুন্দর সুমধুর বাজনার শব্দ ছড়িয়ে আছে। রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ সিংহদ্বারে বসেছে বাদ্যকরগণ, তারা মিহি সুরে বাধ্য পরিবেশন করে চলেছে, তারই সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

বনহুরকে ঘিরে ধরলো বিজয়ার সখীরা।

একজন এগিয়ে এসে বললো—বোবা নাকি, কথা বলছে না যে!

অন্য একজন বললো—হয়তো বোবাই হবে।

আর একজন বললো—কিরে বিজয়া, সত্যি ও বোবা নাকি?

বিজয়া হেসে বললো—আমিও ঠিক জানি না।

বলিস কিরে, এতদিন প্রাসাদে আছে অথচ লোকটা বোবা কিনা জানিস না? আয় ভাই, আমরা আজ ওকে পরীক্ষা করে দেখবো সত্যি বোবা কিনা। একজন সখী বিজয়ার অন্য সখীদের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো।

সখীরা সবাই যোগ দিলো ওর কথায়—ঠিক বলেছিস, এতক্ষণ যার মুখে একটা কথাও শুনতে পেলাম না, তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

বনহুর ওদের কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসছিলো।

একজন তরুণী বললো—ভীল যুবক, বলো দেখি আমার সখী বিজয়াকে তোমার কেমন লাগে?

বনহুর একটি ফুল মালা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দেখালো তাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো তরুণী দল।

বিজয়া কিন্তু হাসলো না, সে অভিমানভরা মুখে তাকালো তিলকের দিকে।

একজন সখী বিজয়ার চিবুকে মৃদু নাড়া দিয়ে বললো—ফুলের মত তোমাকে ভাল লাগে ওর, দেখলে না ফুলটা দেখালো ও।

অন্য আর একজন সখী বললো—দাঁড়াও আমি ওকে কথা বলাবো।

সত্যি পারবি? বললো অপর একজন।

সখীটা বললো—নিশ্চয়ই পারবো। সে কথাটা বলে হাউজ থেকে পানি নিয়ে ছুড়ে দিতে লাগলো তিলকের গায়ে। তারপর হেসে বললো—এখনও কথা বলো নয়তো স্নান করিয়ে ছাড়বো।

তবু বনহুর নীরব, সে শুধু মৃদু মৃদু হাসছে।

একজন সখী বললো—আয়, আমরা সবাই মিলে ওকে হাউজে ঠেলে ফেলে দেই। নিশ্চয়ই তাহলে কথা বলবে।

তরুণীদল খুশি হয়ে ছুটে গেলো, সবাই মিলে ধরে ফেললো তিলককে, কিন্তু একচুলও ওকে নড়াতে পারলো না। মেয়েরা হিমসিম খেয়ে গেলো। সকলের চোখ কপালে উঠলো, লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো সবাই।

বিজয়ার দু'চোখে গর্বের ছায়া ফুটে উঠলো।

তরুণীরা যখন তিলককে একচুলও নড়াতে পারলো না, তখন তারা বিদায় গ্রহণ করলো।

সবাই যখন চলে গেলো এগিয়ে এলো বিজয়া বনহুরের পাশে। অতি নিকটে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বললো—তিলক!

বলুন রাজকুমারী?

এতক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা বললে না কেন?

প্রয়োজন মনে করিনি।

ওরা মনে করলো সত্যি তুমি বোবা।

তাতে আমার কিছু মন্দ হবে না জানতাম।

জানো ওরা তোমার কত প্রশংসা করলো?

শুনেছি।

তুমি ভীল যুবক তবু তোমার চেহারা নাকি রাজপুত্রের মত।

সত্য যা তাই ওরা বলেছে!

সত্যি তিলক, তোমার চালচলন, কথাবার্তায় মনে হয় না তুমি ভীল জাতির ছেলে!

সেটা হয়তো আমার চেহারার দোষ। কারণ আমি চাই না আমাকে কেউ রাজকুমার বা রাজপুত্র বলুক। ভীল সন্তান আমি, আমাকে ভীল বললে বেশি খুশি হবো।

তুমি কি নিজের ভাল চাওনা তিলক?

কে না নিজের ভাল চায়, আমিও আমার ভাল চাই রাজকুমারী।

কই, তোমার আচরণে মনে হয় না তুমি তোমার ভাল চাও। নীলদ্বীপের অভিশাপ মুক্ত করে তুমি নীলদ্বীপবাসীর যে উপকার করেছো, তার মূল্য হয় না। কই, তুমি তো তার কোনো প্রতিদান চাইলে না মহারাজের কাছে?

আমার তো কিছুর প্রয়োজন নেই রাজকুমারী, কি চাইবো তাঁর কাছে?

অর্থ, ঐশ্বর্য......

ওসবে আমার কোনো মোহ নেই।

তিলক!

হাঁ, আমি ভীল-সন্তান, অর্থ-ঐশ্বর্য দিয়ে আমি কি করবো? তাছাড়া আমি এসব রাখবোই বা কোথায়?

তিলক, তুমি এসব ছাড়াও যা চাইবে মহারাজ তাই দেবেন তোমাকে।

আমার চাইবার মত কিছুই তো দেখছি না।

কি বললে, তুমি রাজবাড়িতে চাইবার মত কিছুই দেখলে না?

না।

তিলক, তুমি যা চাইবে তাই পাবে। তুমি অসাধ্য সাধন করেছো। মহারাজ তোমার বাসনা অপূর্ণ রাখবেন না। বলো তুমি কি চাও?

বলেছি আমার কোনো মোহ নেই।

তিলক, আমার চোখের দিকে তাকাও দেখি।

তিলক চোখ দুটি তুলে ধরলো বিজয়ার চোখের দিকে। দেখলো সে, বিজয়ার দৃষ্টিতে আবেগময় ভাবের আকুলতা। ধীরে ধীরে দৃষ্টি নত করে নিলো তিলক।

বিজয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—তিলক, চাইবার মত তুমি কি কিছুই খুঁজে পাচ্ছো না?

এবার তিলক নীরব, বিজয়ার প্রশ্নের কোনো জবাব সে দিতে পারলো না চট্ করে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে মহারাজ স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। বিজয়া আর তিলককে দেখে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন তিনি—তোমরা এখানে? তিলক, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি বৎস।

বিজয়া বললো—বাবা, ওকে আমরা এখানে ধরে এনেছিলাম। আমার সখীরা ওকে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে।

চমৎকার, চমৎকার......এবার মহারাণী তোমাকে নিজ পুত্র বলে অভিষেক করতে মনস্থ করেছে বৎস, তাই তোমার খোঁজে এখানে এসেছি। এসো বাবা, এসো। চল মা বিজয়া।

বিজয়া বললো—চলো বাবা।

পিতা-পুত্রী এগিয়ে চললো।

ওদের পিছনে এগিয়ে চললো তিলক।

❑

মহারাজ, আপনি আমার পরিচয় জানেন তবু আপনি এ অনুরোধ করছেন, আমি সেজন্য দুঃখিত। কথাগুলো বলে থামলো বনহুর।

মহারাজ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—বাবা, তুমি যদি অমত করো তবে রাণী আত্মহত্যা করবেন। তাঁকে বাঁচাতে পারবো না তিলক।

কিন্তু......

আর কোনো কিন্তু নয়, তোমাকে মত দিতেই হবে। আমি জানি, তুমি মহৎ, তুমি মহান। আমার ব্যথা তুমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবে। রাণীকে বাঁচাতে হলে তোমাকে পুত্র হিসেবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে। কথা দাও তিলক, তুমি রাজি আছো?

বনহুর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পুনরায় বলে উঠেন মহারাজ—চুপ করে থেকো না বাবা, কথা দাও।

বনহুর তখন ভেবে চলেছে...মহারাণী তাকে অভিষেক করে পুত্র বলে গ্রহণ করতে চান, চিরদিনের জন্য তাকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তিনি। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে—তার মা আছেন, তিনি যদি জানতে পারেন কোনোদিন এ কথা? না না, তা হয় না, অভিষেক করে পুত্র হিসেবে সে আর একজনকে জননীরূপে গ্রহণ করতে পারে না। শুধু কি তাই, যখন

অভিষেক হবে, মহারাণী তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করবেন, তখন কি তিনি সহজে ছেড়ে দিতে চাইবেন তাকে? কঠিন হবে সে বন্ধন ছিন্ন করতে, কারণ তাকে পুত্র হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

মহারাজ ব্যাকুলভাবে বললেন—আবার কি ভাবছো তিলক? তুমি যাই বলো, আমার সর্বনাশ তুমি করতে পারবে না। রাণী যদি না বাঁচেন তবে আমার রাজ্য শ্মশানে পরিণত হবে। আমার প্রজাগণ মাতৃহারা হবে। বলো, জবাব দাও, চুপ করে থেকো না।

বনহুর এবার কথা না বলে পারলো না, বললো—মহারাজ, আমার মায়ের অমতে আমি পারবো না কিছু করতে।

তোমার মা আছেন?

হাঁ।

কোথায়, কোথায় আছেন তিনি?

কান্দাই শহরে।

আমি যাবো, সেখানে যাবো, তোমার মায়ের মত নিয়ে আসবো। বনহুর, রাণীকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বহু রাজপুত্রের নাম আমি তাঁর কাছে বলেছি কিন্তু তিনি কিছুই শুনতে রাজি নন। তাঁর এক কথা, তিলককে পেয়ে আমি ভুলে গেছি আমার পাঁচ সন্তানকে। তিলকের মধ্যে বেঁচে আছে আমার স্বপন, প্রদীপ, চঞ্চল, পলাশ ও তপন। ভেবে দেখো বাবা, কতবড় একটা কর্তব্য আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত......

বেশ, কথা দিলাম আমার মা যদি মত দেন তবে আমি রাজি আছি।

আমি তোমার মায়ের হাতে ধরে মত চেয়ে নেবো। মা হয়ে আর এক মায়ের ব্যথা নিশ্চয়ই তিনি বুঝবেন। যাবো, আমি যাবো সেইখানে, যেখানে আছেন তোমার মা, সেই ভাগ্যবতী জননী......

বনহুর কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

মহারাজ তখনকার মত বেরিয়ে গেলেন।

এ উৎসবে মহারাণীর সন্তান লাভ হলো না।

মহারাণী কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন।

বিজয়ার মনে একটা অভিমান দানা বেঁধে উঠলো, তিলক তার মাকে উপেক্ষা করলো। একটা ভীল যুবকের এত স্পর্ধা। বিজয়া পিতার কাছে গেলো—বাবা, তিলক আমার মাকে উপেক্ষা করে অপমান করেছে। যত উপকারই সে করুক তবু সে ভীল, একটা জংলীর এত স্পর্ধা?

মা, তুই ওকে জানিস্ না, তাই অমন কথা বলছিস্।

বাবা, আমি এ কয়দিনের মধ্যে ওকে বেশ করে জেনে নিয়েছি, আর জানতে চাই না। বাবা, তোমরা ওকে ভাল বাসলেও আমি ওকে... ... ...

থাক না থাক, আমি সব জানি।

বাবা, আমি ওকে ক্ষমা করবো না। বেরিয়ে গেলো বিজয়া।

বনহুরের কক্ষের দিকে এগিয়ে বললো বিজয়া।

বনহুর তখন পকেটে কিছু খুজঁতে গিয়ে তার হাতে একটা ভাঁজকরা কাগজের টুকরা পেলো—অবাক হলো, এটা তার পকেটে এলো কি করে? বিজয়া এবং সখীদলের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে সে এ কক্ষে চলে এসেছে, তারপর মহারাজের সঙ্গে কথাও হয়েছে এই কক্ষে। জামাটা তখন থেকে গায়েই আছে। তাড়াতাড়ি ভাঁজকরা কাগজখানা খুলে মেলে ধরলো সে চোখের সামনে—

বিজয়া আর তার সখীদের সঙ্গে
মিলে আমিও তোমার গলায়
জয়মাল্য পরিয়ে দেবার সৌভাগ্য
অর্জন করলাম। এজন্য আমি
নিজেকে ধন্য মনে করছি।

—আশা

বনহুর চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বিজয়ার বান্ধবীদের দলে আশাও ছিলো! বনহুর প্রত্যেককে ঠিক মনে করতে পারছে না, কারণ অনেকগুলো মেয়ে ছিলো সেখানে।

বনহুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবছে, এমন সময় বিজয়া প্রবেশ করে সেই কক্ষে।

বনহুর দ্রুত চিঠিখানা পকেটে গুঁজে ফিরে তাকায়।

বিজয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তিলক!

বলুন রাজকুমারী?

আমার মায়ের বাসনা পূর্ণ করতে তুমি রাজি হওনি কেন আমি জানতে চাই?

বনহুর হেসে বলে—আমি গরিব ভীল জাতির ছেলে, মহারাণীর ইচ্ছা পূর্ণ করার মত সাহস আমার হলো না রাজকুমারী।

সাহস হলো না, না তাঁর কথা তুমি উপেক্ষা করেছো?

মত না দেওয়াকে আপনি এখন যা মনে করেন তাই।

তিলক, তুমি কাপালিক কন্যা নীলা এবং কাপালিকগণকে হত্যা করে নীলদ্বীপবাসীদেরকে উদ্ধার করেছো, তাই বলে তুমি পারো না মহারাণীর বাসনাকে অবহেলা করতে। এজন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

যে শাস্তি আমাকে দেবেন মাথা পেতে গ্রহণ করবো কিন্তু একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।

বলো কি কাজ?

আপনার যে সখীরা আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলো তাদের সবাইকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসতে হবে।

কেন, তাদের কাউকে বুঝি পছন্দ হয়েছে তোমার?

পরে বলবো।

আজ নয়, কাল সবাইকে নিয়ে আসবো তোমার কাছে। কিন্তু......

বলুন রাজকন্যা, কিন্তু কি?

তিলক, আমাকে তোমার ভাল লাগে না বুঝি?

বামন হয়ে চাঁদ পাওয়ার আশা......রাজকুমারী ক্ষমা করুন, অমন দূরাশা আমি করতে পারি না।

তুমি নিজেকে এত নগণ্য, তুচ্ছ মনে করো কেন তিলক!

জানি না।

বলেছি-তুমি রাজকুমার হবে। কেউ জানে না তুমি ভীল সন্তান। কেন তুমি মিছেমিছি......বিজয়া বনহুরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়।

বিজয়া হঠাৎ সরে আসে, বনহুরের বুকে মাথা রেখে আবেগভরা কণ্ঠে বললো—তিলক, আমি তোমাকে আর কোনোদিন যেতে দেবো না।

বনহুর নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিজয়ার নিশ্বাসের উষ্ণতা বনহুরের জামা ভেদ করে তার বুকে লাগছে। মাথাটা এসে লেগেছে তার চিবুকের সঙ্গে। ওর চুলের মিষ্টি একটা গন্ধ প্রবেশ করছে বনহুরের নাকে। বিজয়ার মুষ্টিবদ্ধ হাতে তার জামার অংশ আটকে আছে।

বলে বিজয়া—তিলক, বলো, কথা দাও, আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি?

বনহুর ক্রমান্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়ছে, শিরায় শিরায় জাগছে একটা অনুভূতি। দক্ষিণ হাতখানা এসে বিজয়ার কাঁধ স্পর্শ করলো। পরক্ষণেই বনহুর সংযত হয়ে বললো—রাজকুমারী, পরে আপনাকে কথা দেবো। বিজয়ার মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্য হতে নিজের জামার অংশ ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো বনহুর।

বিজয়া বললো—কাল আবার দেখা হবে।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

বিজয়া চলে যেতেই বনহুর আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। নিজের চেহারাটাকে এত করে সে বদলে ফেলেছে তবু কেন তাকে যে দেখে সে এমন করে ভালবাসতে চায়। চুলগুলো এলোমেলো, কানে বালা, হাতে বালা, জামাটাও সামান্য ফতুয়া ধরনের। খালি পা, পরনে সামান্য ধূতি।

ভীল যুবক ছাড়া তাকে কেউ ভদ্র বলতে পারে না, তবু তার প্রতি কেন এত মোহ...বনহুর নিজ চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলো তন্ময় হয়ে।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তার কানে, কোমল নারীকণ্ঠ—যতই ছদ্মবেশ ধারণ করো, আত্মগোপন করতে পারবে না...পরক্ষণেই হাসির শব্দ, তারপর হাসি থেমে যায়, পুনঃ সেই কণ্ঠ—বিজয়ার হৃদয় তুমি জয় করে নিয়েছো, তার সঙ্গে নিজেও জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছো......সাবধান, হারিয়ে যেও না যেন......

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। দ্রুত এগিয়ে গেলো জানালার দিকে, সেখানেও কেউ নেই। দরজা খুলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরে। এদিক সেদিক অনেক সন্ধান করেও কাউকে পেলো না বনহুর, নীরবে ফিরে এলো কক্ষমধ্যে। এ কণ্ঠস্বর কার? কে তাকে এভাবে লক্ষ্য করছিলো আর তাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললো? নিশ্চয়ই আশা। বনহুর আপন মনেই হাসলো।

ঐ মুহূর্তে পিছন বেলকুনিতে অদৃশ্য হলো একটি নারীমূর্তি।

মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—নীলদ্বীপের মহারাজ এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, বলিস্ কি?

বনহুর ছোট্ট বালকের মত মাথা দোলায়—হাঁ মা।

কেন রে, হঠাৎ নীলদ্বীপের মহারাজের আমার সঙ্গে কি প্রয়োজন?

তা আমি কেমন করে বলবো বলো? চলো না মা, দেখা করবে।

কি জানি আমার যেন কেমন আশঙ্কা হচ্ছে।

মনিরা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিলো স্বামী এবং শাশুড়ীর কথাবার্তা, এবার বলে উঠলো—মামীমা, মিছেমিছি তোমার এত আশঙ্কা। নীল দ্বীপের মহারাজ অতি মহৎজন। আড়াল থেকে আমি তাঁকে দেখেছি, দেখে সেই রকমই মনে হলো।

বেশ, চল্ যাচ্ছি। মরিয়ম বেগম উঠে পড়লেন।

বনহুর মাকে সঙ্গে নিয়ে হলঘরে ফিরে এলো।

বৃদ্ধ মহারাজ হীরন্ময় সেন মরিয়ম বেগমকে দেখে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং সসম্মানে নমস্কার করলেন।

মরিয়ম বেগম মহারাজকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসার জন্য অনুরোধ করলেন।

আসন গ্রহণ করলেন মহারাজ হীরন্ময় সেন।

মরিয়ম বেগমও বসলেন।

সরকার সাহেবও এসেছিলেন, মরিয়ম বেগম তাঁকেও বসার জন্য বললেন।

সরকার সাহেব আসন গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু তার মনে নানারকম প্রশ্ন উঁকি মারছিলো। হঠাৎ নীল দ্বীপের মহারাজের আগমন বিস্ময়কর বটে। তিনি উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মরিয়ম বেগম কিছু বলবার পূর্বে বনহুর নিজে একপাশে আসন দখল করে চুপটি করে বসে পড়ে। মুখমণ্ডলে তার একটা সুস্পষ্ট চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তার মা মহারাজ হীরন্ময়ের কথায় কি জবাব দেবেন কে জানে।

মহারাজই প্রথমে কথা বললেন— আপনার মত ভাগ্যবতী জননীর সাক্ষাৎলাভে আমি ধন্য হলাম। যার গর্ভে এমন সন্তান, তিনি শুধু স্বার্থক জননী নন, বিশ্বনন্দিতা তিনি।

মরিয়ম বেগম একটু হেসে বললেন—সব খোদার ইচ্ছা।

দেখুন, আমি সেই নীল দ্বীপ থেকে কেন ছুটে এসেছি এবার সেই কথা বলতে চাই। কিন্তু তার পূর্বে আমাকে কয়েকটা কথা জানাতে হচ্ছে।

বলুন?

আপনাকে ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে আমার কথাগুলো।

শুনবো।

বলতে শুরু করলেন মহারাজ হীরন্ময় সেন...রায়হান বন্দরে বনহুরের অনুচর হস্তে ধরা পড়বার পূর্বে নীল দ্বীপে যে অভিশাপ এসেছিলো, কিভাবে তার পাঁচ পুত্র এবং শত শত নিষ্পাপ প্রজাকে কাপালিক হস্তে তুলে দিতে হয়েছিলো সব বললেন, তারপর বললেন, সংসার ত্যাগ করে স্ত্রী-কন্যা-আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে দেশত্যাগী হলাম। সমস্ত মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে ভিখারী বেশে ঘুরতে লাগলাম দেশ হতে দেশান্তরে। একদিন লোক মুখে শুনলাম এক মহৎ, মহাপ্রাণ জনের কথা, সেই পারবে নীল দ্বীপকে কাপালিকের কবল হতে রক্ষা করতে। নতুন এক আলোকরশ্মি সন্ধান পেলাম, তারপর থেকে খুঁজে ফিরতে লাগলাম সেই মহাপ্রাণ শক্তিশালী ব্যক্তিকে। হাঁ, একদিন আমার ঝোলা থেকে একটি চিঠি বের হলো, আর সেই চিঠির সূত্র ধরে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলো তখনও আমি ভাবতে পারিনি, আমি যাকে খুঁজে মরছি এ তারই আশ্রয়। তারপর সবাই বললেন মহারাজ হীরন্ময় সেন......

মহারাজ হীরন্ময় সেনের কথা শুনতে গিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে শিউরে উঠছিলেন মরিয়ম বেগম। বিস্ময়ে আরষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মুখে তাঁর কোনো কথা সরছিলো না। চিত্রার্পিতের ন্যায় শুধু শুনে যাচ্ছিলেন।

মহারাজ সব কথা শেষ করে বললেন—মহারাণী পাঁচপুত্রকে হারিয়ে উন্মাদিনীর মত হয়ে পড়েছিলেন। যেদিন তিনি তিলককে দেখলেন সেইদিন তিনি ওকে নিজ পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। ওকে পেয়ে রাণী অনেকটা

প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, আপনি দয়া না করলে রাণীকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। আপনি জননী, আর এক জননীর ব্যথা আপনি বুঝবেন।

না না, এ সব আপনি কি বলছেন, আমার একমাত্র সন্তান...

আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না বোন।

সব দিতে পারি কিন্তু......

মা, তুমি মত দাও মা। বললো বনহুর।

না না, তা সম্ভব নয়, তোকে শপথ করে পুত্র হতে হবে।

তাতে দোষ কি মা? আমার এক জননী ছিলো, এবার দু'জন হবে।

আমাকে তুই হত্যা করে যেখানে খুশি চলে যা, আমি তবু সহ্য করবো কিন্তু জীবিত থেকে তোকে আর একজনের হাতে সঁপে দিতে পারবো না।

সরকার সাহেব এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন, এবার তিনি কথা না বলে পারলেন না। তিনি বললেন—বেগম সাহেবা, আপনি অবুঝ হচ্ছেন কেন? মত দিন, কারণ আপনার সন্তান আপনারই থাকবে।

আপনি চুপ করুন সরকার সাহেব, আমি পারবো না এ কাজে মত দিতে। কথাটা বলে অন্তপুরে চলে যান মরিয়ম বেগম।

মহারাজ বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলেন—বাবা, কোন্ মুখ নিয়ে আমি নীল দ্বীপে ফিরে যাবো? রাণীকে কথা দিয়ে এসেছি তোমার তিলকে আমি নিয়েই আসবো! বলো, বলো বাবা, কি উত্তর দেবো আমি তাঁকে গিয়ে?

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়েছে, মহারাজের কথায় কোনো জবাব সে দিতে পারলো না।

মহারাজের অশ্রু বৃদ্ধ সরকার সাহেবকে বিচলিত করে তুললো। বনহুরও অত্যন্ত ব্যথিত হলো, সে ভেবেছিলো তার মা নিশ্চয়ই অমত করবেন না। মহারাজের কথায় তার হৃদয় গলে যাবে।

মরিয়ম বেগম অন্তপুরে প্রবেশ করলেন।

মনিরা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলো, মরিয়ম বেগম ভিতরে আসতেই বলে উঠলো—মামীমা, আপনি ঠিকই করেছেন, কোন সাহসে নীল দ্বীপের মহারাজ এসেছেন আপনার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিতে?

হাঁ, আমি দেবো না, আমার সন্তানকে আমি দেবো না—না না, কিছুতেই না......

বনহুর এসে দাঁড়ায় সেখানে, হেসে বলে—মা, তুমি স্থির হয়ে ভেবে দেখো। তাছাড়া আমি কি সত্যি সত্যি তোমার কোল থেকে চিরদিনের জন্য সরে যাবো? আমি কি পর হয়ে যাবো?

তা হয় না, তা হয় না মনির। আমার সন্তান আর এক জনের হবে, এ আমি ভাবতে পারি না......

মা মা গো, তুমি মা হয়ে এর একটি মায়ের ব্যথা বুঝতে পারছো না? আমি যেমনটি ছিলাম ঠিক তেমনি থাকবো তোমার হয়ে!

মনিরা এতক্ষণ ফুলছিলো মনে মনে, এবার সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—যা সম্ভব নয় তা নিয়ে কেন বাড়াবাড়ি করছো! মা মত দেবেন না কিছুতেই।

মনিরা, তুমিও অবুঝ হলে?

অবুঝ আমরা কেউ নই, তুমি যা খুশি তাই করবে সেটা সহ্য করবেন মামীমা?

তুমিও যদি ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে চেষ্টা না করো তাহলে আমি নিরুপায়।

মনিরা চলে যায় নিজের ঘরে।

বনহুর মনিরার পিছু পিছু তার কক্ষে প্রবেশ করে।

মনিরা গম্ভীর হয়ে পড়েছে ভয়ানকভাবে!

বনহুর মৃদু হেসে মনিরা চিবুকটা তুলে ধরে বলে—মনিরা, তুমি তো জানো কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও থাকতে পারি? মনিরা, তুমিও কি বুঝতে পারছো না সেই মহিলার ব্যথা! পাচ-পাঁচটি সন্তানকে হারিয়ে তাঁর কি অবস্থা হয়েছে......

কেন, তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে কি আর কেউ ছিলো না যাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে পারে?

বহু আছে কিন্তু তিনি কেন যে আমার প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন বুঝতে পারছি না। হয়তো আমাকে তার এদের কারও মত মনে হয়েছে। মনিরা, তুমি নিজেও যদি এ অবস্থায় পড়তে, তবে কিছুতেই পারতে না তাকে বিমুখ করতে। এক অসহায় মায়ের সেই করুণ মুখ, সেই অশ্রুভরা চোখ......মনিরা, তুমি মাকে একবার বুঝাও, নিশ্চয়ই তিনি তোমার কথা শুনবেন। বনহুর মনিরার হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে।

মনিরা পারে না আর শক্ত হয়ে থাকতে, বলে—তুমি ওখানে থেকে যাবে না তো?

অসম্ভব! তোমাদের ছেড়ে আমি নীলদ্বীপে চিরদিনের জন্য থেকে যাবো, এ কথা ভাবতে পারো? মা, তুমি নূর-তোমরাই যে আমার স্বপ্ন মনিরা......

সত্যি বলছো, আমাদের ভুলে যাবে না তো সেখানে গিয়ে?

না, কথা দিলাম অভিষেক হলেই চলে আসবো।

যদি মহারাণী তোমাকে ছেড়ে না দেন?

পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে আটকে রাখতে পারে নি, পারবেও না কোনোদিন। তুমি তো জানো, তোমার স্বামীর কত কাজ। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার মত সময় আছে তার? চলো, চলো মনিরা, মাকে বুঝিয়ে বলবে, চলো?

কি জানি কেন যেন আমার মনটাও বড় অস্থির লাগছে।

সে তোমার মনের একটা খেয়াল।

না, খেয়াল নয়, খেয়াল নয়—বুকের মধ্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি আর ফিরে আসবে না।

হাসে বনহুর—নারী মন এমনি হয়। মনিরা, আমাকে তুমি তাহলে বিশ্বাস করতে পারছো না?

তোমাকে বিশ্বাস না করলে আমি কাকে বিশ্বাস করবো বলো?

তবে চলো, মাকে বুঝিয়ে বলবে চলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো বনহুর।

মনিরা পারলো না আর নিশ্চুপ থাকতে।

বনহুর আর মনিরা যখন মায়ের কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালো তখন শুনতে পেলো ভিতরে সরকার সাহেবের গলা, তিনি বলছেন—বেগম সাহেবা, আপনার সন্তান অবুঝ নয়, সে অতি বুদ্ধিমান। তাকে ধরে রাখে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। আপনার ছেলে আবার ফিরে আসবে আপনার কাছে......

আপনি আমাকে বৃথা বুঝাতে চেষ্টা করছেন সরকার সাহেব। নীলদ্বীপের মহারাণী আমার মনিরকে চিরদিনের জন্য আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমি জানি, সব জানি। মরিয়ম বেগম বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

বনহুর মনিরার কানে মুখ নিয়ে বললো—যাও মনিরা, এবার তুমি যাও! মাকে বুঝাতে চেষ্টা করো।

মা কিছুই বুঝবেন না।

তুমি পারবে মনিরা মাকে বুঝাতে, সে ভরসা আমার আছে।

বেশ, আমি যাচ্ছি।

যাও, যাও মনিরা।

বনহুর দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে।

মনিরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে মামীমার পাশে এসে দাঁড়ায়।

সরকার সাহেব বেরিয়ে যান মাথা নত করে, কারণ তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সরকার সাহেব বেরিয়ে যেতেই মনিরা বলে উঠলো—মামীমা, কাউকে কোনোদিন বিমুখ করতে নেই। আপনার সন্তানকে কেউ যদি নিজের সন্তানরূপে ভালবাসতে চায় তাতে দোষ কি......

মনিরা, তুইও আমাকে ভোলাতে এসেছিস্?

ভোলাতে নয়, বুঝাতে। মামীমা, ও শিশু নয় যে কেউ ওকে চিরদিনের জন্য ধরে রাখবে। যখন খুশি চলে আসবে, শুধু আর একটি মাকে সে পুত্রের অধিকার দেবে।

তুইও ওকে ছেড়ে দিতে চাইছিস্ মনিরা?

মামীমা, তুমি তো জানো ওকে কেউ কোনোদিন আটকে রাখতে পারেনি—পারবেও না। সেই ভরসা নিয়েই আমি তোমাকে মত দিতে বলছি।

বেশ, তাই হোক......

মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হয় না, বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—মা, মাগো, আমি তোমার সন্তান, চিরদিন তোমারই থাকবো।

মরিয়ম বেগমের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে বনহুরের মাথার উপর।

❑

মহা ধুমধামের সঙ্গে অভিষেক-পর্ব শেষ হলো।

তিলককে মহারাণী পুত্র হিসেবে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি নিজ হাতে নীলদ্বীপের দীন-দুঃখীদের মধ্যে প্রচুর অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র দান করলেন অকাতরে। রাজপ্রাসাদের যেন আনন্দের বন্যা বয়ে চললো।

মহারাণী নিজ হাতে তিলকের দেহে রাজকীয় পোষাক পরিয়ে দিলেন। বারবার ওকে দেখতে লাগলেন অপূরণীয় দৃষ্টি নিয়ে। একমুহূর্ত ওকে চোখের আড়াল করতে চান না তিনি।

বিজয়ার আনন্দ সবচেয়ে বেশি। তিলক চলে যাবার পর থেকে তার মনের খুশি চিরতরে অন্তর্ধান হয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, যে চলে গেলো সে আর আসবে না।

তিলক ফিরে এসেছে, তার স্বপ্নের রাজকুমার ফিরে এসেছে—এ যে বিজয়ার পরম সৌভাগ্য। সে সখীদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। হাসি-গান আর আনন্দে রাজপ্রাসাদ পূর্ণ হয়ে উঠেছে আজ।

মহারাজ এতদিনের তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মহারাণীর প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা বনহুরকে কম মুগ্ধ ও অভিভূত করলো না, সেও মাতৃহারা হয়ে পড়লো যেন।

বিজয়া একসময় নির্ভতে বনহুরকে ধরে ফেললো—তিলক, জানতাম তুমি আসবে।

বনহুর চোখ তুলে তাকায়, তার মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ বের হলো—উঁ!

তিলক, তুমি কত সুন্দর!

উঁ, কি বললেন রাজকুমারী?

কত সুন্দর তুমি!

আপনি এসব কি বলছেন রাজকুমারী?

আপনি নয়, তুমি বলবে এখন থেকে।

সর্বনাশ, তুমি বলবো আপনাকে? তা আমি পারবো না।

কেন পারবে না?

আপনি রাজকন্যা আর আমি হলাম ভীল-সন্তান!

এখন তুমি আর ভীল সন্তান নও, তুমি রাজকুমার।

হেসে উঠলো বনহুর তার অভ্যাসমত হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ... ...

বিজয়া বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো, এমন করে সে কোনোদিন কাউকে হাসতে দেখেনি। কি অদ্ভুত সে হাসি, প্রাসাদের পাথরগুলো যেন দুলে দুলে উঠছে সে হাসির শব্দে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো—রাজকুমারী, আপনারা সভ্য সমাজের উচ্চস্তরের লোক, আর আমরা জংলী অসভ্য—যেমন মানুষ আর বানরে পার্থক্য তেমনি আপনাতে আর আমার মধ্যে প্রভেদ।

তিলক। এসব তুমি কি বলছো?

সত্যি যা তাইতো বলছি রাজকুমারী।

ওসব কোনো কথাই তোমার আমি শুনবো না। বিজয়া তিলকের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো আবার—তোমার গলায় মালা দিয়েছি তিলক, সে মালা তুমি আর আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো না।

বনহুর কোনো জবাব দিতে পারলো না।

ততক্ষণে বিজয়ার অন্যান্য সখী এসে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

খিল খিল করে হেসে উঠে সবাই।

বনহুরের মনে একটা শিহরণ জাগে, এদের মধ্যেই হয়তো আছে সেই আশা, সেই অদ্ভুত মেয়েটি। কিন্তু কোনটা সেই আশা কে জানে।

বনহুর ওদের সবাইকে লক্ষ্য করছিলো নিপুণ দৃষ্টি নিয়ে।

বিজয়া বলে উঠলো—ওদের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো তিলক?

হেসে বলে বনহুর—দেখছি এদের মধ্যে কে রাজকুমারীর প্রিয় বান্ধবী।

তাই নাকি? আচ্ছা, বলোতো এদের মধ্যে সবচেয়ে কে আমার প্রিয়?

সখীরা সবই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর সবাইকে নিপুণভাবে দেখবার সুযোগ পেলো, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে বললো প্রত্যেকটা তরুণীকে, মুখমণ্ডল থেকে পা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। শুধু তাই নয়, চোখ দুটির দিকে তাকাতে লাগলো বনহুর স্থির দৃষ্টি নিয়ে। বনহুরের দৃষ্টির কাছে তরুণীর যেন কুঁকড়ে গেলো লজ্জাবতী লতার মত।

সবাইকে দেখা শেষ করে সরে দাঁড়লো বনহুর।

বিজয়া বললো—বলো, কে আমার সবচেয়ে প্রিয়, বলো?

বনহুর মাথা চুলকাতে লাগলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি তীর এসে গেঁথে গেলো বনহুরের পায়ের কাছে

একসঙ্গে চমকে উঠলো সবাই।

বিজয়া অস্ফুট কণ্ঠে বললো—কার এমন সাহস প্রাসাদের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করলো!

বনহুর ততক্ষণে তীরফলকটা তুলে নিয়েছে হাতে। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখলো তীরটার সঙ্গে গাঁথা আছে একটি কাগজের টুকরা। দ্রুতহস্তে খুলে নিয়ে মেলে ধরলো, কাগজের টুকরায় লিখা আছে মাত্র কয়েকটা কথা—

—"বনহুর, তোমার অন্বেষণ বৃথা।
কারণ যাকে খুঁজছো সে নেই
বিজয়ার সখীদের মধ্যে।"

—আশা

নেই, নেই সে এদের মধ্যে। আপন মনেই বলে উঠে বনহুর।

বিজয়া সরে আসে—কি বললে, এদের মধ্যে আমার প্রিয় বান্ধবী কেউ নেই?

বনহুর বললো—না, নেই।

তিলক, তুমি এতবড় মিথ্যা কথা বলতে পারলে? জানো এরা সবাই আমার প্রিয় বান্ধবী।

বনহুর যখন বিজয়ার কথার উত্তর দেবে ভাবছে তখন হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো দূরে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে রাস্তায়। কয়েকজন রাজকর্মচারী কয়েকজন বন্দীকে শিকলে আবদ্ধ করে টানতে টানতে কারাগার প্রাঙ্গণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য লক্ষ্য করে বনহুরের ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

বিজয়া হেসে বললো—ওরা মুসলমান।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মুসলমান বলেই কি ওরা এই শাস্তি পাচ্ছে?

না, তা নয়।

তবে কি?

তুমি জানো না তিলক, নীল দ্বীপের চারপাশে যে বাঁধ তৈরি হচ্ছে, সেখানে বহু মুসলমান বাস করে। বাঁধ তৈরির ব্যাপারে তারা কাজ করছে। যারা বাঁধ তৈরি ব্যাপারে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি না হয় কিংবা সেখানে কাজ করতে রাজি না হয় তাদের ঐ ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়, তারপর বন্দী করে রাখা হয়। কথাগুলো স্বচ্ছকণ্ঠে বললো বিজয়া। সে জানে না তিলক কি জাতি এবং সে কে, তাই কথা গুলো বলতে তার বাধলো না একটুও।

বনহুরের মুখমণ্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

বিজয়া বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে সখীদের চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো।

সখীরা সবাই চলে গেলো।

বিজয়া সরে এলো ঘনিষ্ঠ হয়ে বনহুরের পাশে, বললো—হঠাৎ তোমার কি হলো তিলক?

বনহুর বললো—আমি জানতাম তোমার বাবা মহারাজ হীরন্ময় অতি মহৎজন, কিন্তু......

বলো, থামলে কেন?

বলবো, সব বলবো তোমাকে বিজয়া।

তিলক! তিলক, তুমি আমাকে তুমি বলেই বলবে আর নাম ধরে ডাকবে। সত্যি তোমার মুখে আমার নাম অপূর্ব শোনালো!

বিজয়ার কথাগুলো বনহুরের কানে পৌঁছলো কিনা কে জানে, তার মনের মধ্যে তখন আলোড়ন চলেছে। নীল দ্বীপে মুসলমানদের উপর এইরকম অকথ্য অত্যাচার চলেছে। কি ভয়ঙ্কর এক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তারা। খোদা হয়তো এর একটা বিহিত ব্যবস্থার জন্যই তাকে নীল দ্বীপে আটকে রাখলো। কাপালিক হত্যার পরই যদি ফিরে যেতো সে কান্দাই, তাহলে সে এর বিন্দুমাত্র জানতো না।

বিজয়া বনহুরকে গম্ভীর হয়ে ভাবতে দেখে বললো—কি ভাবছো তিলক?

ভাবছি নীল দ্বীপের চারপাশে যে বাঁধ তৈরি হচ্ছে সেটা একবার আমার দেখা দরকার।

ও এই কথা? এ নিয়ে ভাবতে হবে—আজই আমি পিতাকে বলে তোমার সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো।

খুশি হলাম তোমার কথা শুনে বিজয়া।

বনহুরের ইচ্ছা বিজয়ার মুখে শুনে মহারাজ হীরন্ময় খুশিই হলেন, তিনি মন্ত্রী পরশু সিংকে ডেকে জানালেন কথাটা।

পরশু সিং ছিলো যেমন দুর্দান্ত তেমনি নির্দয় ধরনের। বিশেষ করে নিরীহ মুসলমানদের প্রতি ছিলো তার অহেতুক একটা প্রতিহিংসামূলক মনোভাব। নীল দ্বীপে মুসলমান বাস করবে, এটা যেন তার সহ্যের বাইরে। পরশু সিং মহারাজ হীরন্ময়কে যা বুঝাতো তিনি তাই বুঝতেন।

নীল দ্বীপটিকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করার জন্য নীলদ্বীপের চারপাশে সুউচ্চ বাঁধ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ প্রায়ই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নীলদ্বীপের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হতো এবং বহু লোকজন মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাতো। এই বাঁধ তৈরি করে নীলদ্বীপকে রক্ষা করাই মহারাজের উদ্দেশ্য। বাঁধ তৈরি শুরু হয়েছে এবং কাজ চলছে। বিরাট বিরাট পাথরের চাপ দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই বাঁধ।

এই বাঁধ তৈরি সহজ কথা নয়, অত্যন্ত কষ্টকর।

নীলদ্বীপের জনগণ এ বাঁধ তৈরি ব্যাপারে অক্ষম তাই মুসলমানদের প্রতি কঠিন জুলুম করা হয়েছে—এ বাঁধ তৈরি তাদের দ্বারাই সমাধা করতে হবে।

নীল দ্বীপের উত্তর পূর্বদিকে বাস করতো কিছুসংখ্যক মুসলমান। এরা খুব ধনবান কিংবা শিক্ষিত ছিলো না। এরা অত্যন্ত সরল-সহজ-নিরীহ ছিলো। মহারাজ হীরন্ময়ের প্রধানমন্ত্রী পরশু সিং এদের উপর নির্দেশ দিলো— এ বাঁধ তারাই তৈরি করবে। কেউ যদি এ ব্যাপারে অমত করে বা অবহেলা করে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে। কারাগারে নির্যাতন চালানো হবে তাদের উপর।

পরশু সিং-এর নিষ্ঠুর নির্যাতনের ভয়ে ভীত নিরীহ মুসলমান এই অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করেছে। তারা অবিরত কাজ করে চলেছে। কাপালিকদের অত্যাচারে কিছুদিন বাঁধ তৈরির কাজ বন্ধ ছিলো। কাপালিক হত্যার পর আবার বাঁধ তৈরির কাজ পুরাদমে শুরু হয়েছে।

বনহুর মন্ত্রী পরশু সিং-এর সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে হাজির হলো যেখানে বাধ তৈরির কাজ চলেছে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে বড় বড় পাথর দিয়ে দেয়ালের মত মজবুত করে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। অগণিত মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ অবিরত কাজ করে চলেছে। এক মুহূর্তের জন্য কারও বিশ্রামের উপায় নেই। তাদের পরিচালনা করে চলেছে মহারাজের কর্মচারিগণ। মহারাজ হীরন্ময় মহৎ উদার ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তার মন্ত্রী ছিলো অত্যন্ত শয়তান নির্দয় পাষণ্ড। কাজেই অন্যান্য কর্মচারী যারা মন্ত্রীর নির্দেশমত কাজ করতো তারাও ছিলো ঠিক মন্ত্রী পরশু সিং-এর মতই হৃদয়হীন নরাধম।

বনহুর সেখানে পৌঁছতেই প্রথমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো-একবৃদ্ধ মুসলমানকে ভীষণভাবে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে এক রাজকর্মচারী। এ দৃশ্য লক্ষ্য করতেই মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো বনহুরের।

পরশু সিং দীপ্তকণ্ঠে বললো—দেখুন তিলককুমার, আমার নির্দেশ কত কঠিন। কেউ কাজে অবহেলা করলে তাকে এইভাবে প্রহার করা হয়ে থাকে।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—চমৎকার, এমন সুন্দর নির্দেশ মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

আসুন তিলক কুমার, ওদিকে দেখবেন আসুন।

চলুন।

অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হলো পরশু সিং এবং বনহুর।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই নজরে পড়লো কতকগুলো যুবক মাথায় এবং কাঁধে করে বড় বড় পাথর বহন করে নিয়ে চলেছে। পিছনে চাবুক হস্তে

তাদের অনুসরণ করে চলেছে রাজকর্মচারিগণ। পাথর বয়ে নিয়ে যেতে যেতে গা বেয়ে এক একজনের ঘাম ঝরে পড়ছে, কারও বা মাথা বা হাতের কুনুয়ে কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ এক যুবক পাথরসহ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো অমনি এক রাজকর্মচারী পিশাচের মত চাবুক চালাতে শুরু করলো।

যুবকটি মাটিতে পড়ে রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

চাবুকের আঘাতে আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে।

একদিকে প্রখর রৌদ্রের অগ্নিসম উত্তাপ, পিপাসায় যুবকের কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে তার দেহ দিয়ে, তারপর এই নির্মম কষাঘাত—যুবকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, নাকেমুখে বালি প্রবেশ করছে।

বনহুর অধর দংশন করছিলো, এ দৃশ্য তাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলছিলো তবু নীরব রইলো সে অতি সতর্কভাবে।

পরশু সিং বললো—চলুন এবার তিলক কুমার, বাঁধ দেখবেন চলুন।

পরশু সিং এর কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে আসে বনহুরের, বলে উঠে—চলুন মন্ত্রীবর।

❑

সেদিনের সেই নির্মম দৃশ্যের কথা ভুলতে পারলো না বনহুর কিছুতেই। বাঁধ তৈরির ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি এই অন্যায় অত্যাচার তার ধমনির রক্ত উষ্ণ করে তুললো। এর প্রতিকার তাকে করতেই হবে। বনহুর নিজ ঘরে শুয়ে শুয়ে এ ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। অসহায় নিরীহ কতকগুলো লোকের সেই জঘন্য পরিণতি ভাসতে লাগলো তার চোখের সামনে।

বনহুর ভাবছে তাদের কথা, ভাবছে কিভাবে তাদের রক্ষা করা যায়।

এমন সময় একটি ফুল এসে পড়লো তার বুকের উপর।

চমকে উঠে ফিরে তাকালো বনহুর।

দেখতে পেলো অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে বিজয়া!

বনহুর ততক্ষণে ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে।

এগিয়ে আসে বিজয়া।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বিজয়ার মুখের দিকে।

বিজয়া আজ বনহুরের দৃষ্টির মধ্যে একটা গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করলো। অন্যান্য দিন হলে বনহুর হাসতো ওকে দেখতে পেয়ে আজ যেন নতুন একটা রূপ দেখাতে পেলো সে ওর মধ্যে।

আরও সরে এলো বিজয়া বনহুরের দিকে।

বনহুর তখন ফুলটা রেখে দিয়েছে বিছানার একপাশে।

বিজয়া বললো—তিলক, আজ তোমার কি হয়েছে?

বনহুর পুনরায় দৃষ্টি তুলে ধরলো বিজয়ার মুখে, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আজ নীল দ্বীপের আসল রূপ উদঘাটন হয়ে গেছে আমার চোখে।

তার ম্যানে? বললো, বিজয়া।

মানে বলবার সময় আজ নয়, বলবো একদিন।

তিলক, তোমার কথাগুলো কেমন হেঁয়ালি পূর্ণ মনে হচ্ছে।

কি হয়েছে তোমার বলো তো?

কিছু হয়নি, তবে নীলদ্বীপটা আজ আমার কাছে নীল নরক বলে মনে হচ্ছে।

তিলক!

হাঁ রাজকুমারী।

জানো এ কথা বাবা শুনলে কত ব্যথা পাবেন?

সত্যি যা তা বলতে আমার বাধা নেই রাজকুমারী।

রাজকুমারী...রাজকুমারী, কেন বিজয়া বলে ডাকতে পারো না?

সে অধিকার আমার নেই।

কে বললো সে অধিকার তোমার নেই? তিলক, যেদিন আমি তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিন আমি......

থাক, আর শুনতে চাই না।

তিলক।

হাঁ, ও কথাগুলো আমি বহু নারীর কণ্ঠে বহুবার শুনেছি, কাজেই নতুন করে আর শুনতে আমি রাজি নই। আমি জানি প্রথম দিন যখন তুমি আমার দিকে তাকিয়েছিলে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম তোমার মনের কথা।

সত্যি?

হাঁ।

তবে কেন তুমি এতদিনও আমাকে......

জানাইনি, তাই না?

হাঁ, কেন জানাওনি তোমার মনের কথা?

তুমি রাজকুমারী আর আমি......

বিজয়া বনহুরের মুখে হাতচাপা দিলো—থাক, আর বলতে হবে না। তিলক, এই নির্জন কক্ষে একা একা শুয়ে থাকতে তোমার কি খুব ভাল লাগছে?

খুব ভাল লাগে আমাকে একা থাকতে।

তুমি এক অদ্ভুত মানুষ।

আমি অদ্ভুত মানুষ নই, বলো অদ্ভুত জীব।

খিল খিল করে হেসে উঠে বিজয়া, তারপর ফুলটা তুলে নিয়ে বনহুরের সম্মুখে ধরে—কেমন লাগছে এটা?

খুব সুন্দর।

ফুলের চেয়েও বেশি সুন্দর তুমি তিলক!

হাসে বনহুর।

বিজয়া বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে—চলো বাগানে যাই।

জোছনার আলোতে ঝলমল করছে চারিদিক।

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে বাগানের গাছগুলো।

অপূর্ব লাগছে জোছনার আলো ঝলমল রাত।

বনহুরের হাত ধরে বিজয়া এসে দাঁড়ালো জোছনা প্লাবিত বাগানে।

মায়াময় রাত।

বিজয়ার হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি।

বলে বিজয়া—তিলক, কি সুন্দর রাত, তাই না?

অপূর্ব। বলে বনহুর।

বিজয়া বনহুরের হাত ধরে ওকে একটি আসনে বসিয়ে দেয়।

বনহুর বিজয়ার হাতের পুতুলের মত বসে পড়ে পাথরাসনে। বিজয়া ওর কণ্ঠে বাহু লগ্ন করে বলে—তিলক, ঐ চাঁদের মত তুমি সুন্দর! আমি হারিয়ে গেছি তোমার মধ্যে।

তারপর?

তারপর তুমি আমার। কই, তুমি তো কিছু বলছো না?

আমি ভীল সন্তান, অমন করে বলার সাহস আমার নেই।

আমি তোমাকে সে অধিকার দিলাম। বলো, বলো তিলক। কিছু বলো তুমি! সত্যি সত্যি তোমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আমার হৃদয় ব্যথায় ভেঙে পড়ে।

বনহুর নির্বাক হয়ে বিজয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলে বিজয়া—তুমি গান শুনতে ভালবাসো তিলক'?

গান শুনতে কে না ভালবাসে'? তুমি গান জানো বিজয়া'?

জানি, শুনবে'?

শুনবো'?

বিজয়া গান গায়।

বিজয়ার কণ্ঠস্বর অপূর্ব লাগে বনহুরের কানে। ধীরে ধীরে সে যেন আত্মহারা হয়ে যায়।

বিজয়া গান গাওয়া শেষ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

বনহুর নিশ্চুপ বসে আছে, তার মন তখন বহুদূরে তার কান্দাই আস্তানায়। তার চোখে ভাসছে নূরীর ঢলঢল মুখখানা, ভাসছে মনিরার স্থির নির্মম পবিত্র দুটি চোখ।

বিজয়া বলে—কি ভাবছো তিলক'?

এঁ্যা, কিছু না! চলো, রাত বেড়ে আসছে বিজয়া।

চলো।

বিজয়া আর তিলক যখন বাগান থেকে বেরিয়ে আসছিলো তখন একটা হাসনাহেনা ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে সরে দাঁড়ায় একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী, তার দেহে পুরুষের ড্রেস, হাতে তীর-ধনু।

❑

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় বনহুরের, সে শুনতে পায় একটা নারীকণ্ঠ, কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছে ঠিক বুঝতে পারে না সে। কান পেতে শোনে বনহুর।

......ঘুমাবার সময় নয় বনহুর, আজ তুমি যাদের সেই নির্মম পরিণতি দেখে এসেছো তাদের জন্য তোমাকে সংগ্রাম করতে হবে। পারবে না তুমি তাদের উদ্ধার করতে......

বনহুর ততক্ষণে শয্যায় উঠে বসেছে, চারিদিকে ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকাচ্ছে সে। তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা অস্ফূট কণ্ঠস্বর—পারবো! পারবো......হাঁ, পারবো আমি।

......তবে বিলম্ব করার সময় আর নেই, চলে যাও সেখানে, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করো......

কে, কে তুমি কথা বলছো?

......আমি আশা......

আশা?

......হাঁ। ......

এসো আমার সম্মুখে।

......না। এখনও সময় আসেনি বনহুর......

তুমিই আমাকে মনসুর ডাকুর সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলে?

...হাঁ, এর জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। ......

এরপর বনহুর আর কোনো কথা শুনতে পায় না। চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো, তারপর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো মেঝেতে।

এগিয়ে গেলো বনহুর ওদিকের ড্রেসিং টেবিলের দিকে।

ড্রয়ার খুলে বের করলো একটি জমকালো ড্রেস। পরে নিলো সেই ড্রেস, তারপর আয়নার সম্মুখে দাঁড়ালো, এবার তাকে কেউ রাজকুমার তিলক বলে চিনতে পারবে না।

ভোর হবার বেশি দেরী নেই। অন্ধকারে আত্মগোপন করে বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চললো নীলদ্বীপের যে অংশে বাঁদ তৈরির কাজ চলছে সেখানে।

ভোর হবার পূর্ব হতেই এখানে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

অগণিত মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ কাজ করে চলেছে।

মহারাজের অনুচরগণ কাজ পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে।

এতটুকু শিথিলতা লক্ষ্য করেই চাবুক চালাচ্ছে তারা অসহায় নিরীহ মুসলমানদের উপর।

পৃথিবীর বুক থেকে রাতের অন্ধকার মুছে না যেতেই বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়, আবার সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে না উঠা পর্যন্ত কাজ চলতে থাকে।

নিপীড়িত মুসলমানগণ হাঁপিয়ে উঠেছে তবু তাদের বিরাম নেই, নেই পরিত্রাণ। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে কাজ করতেই হবে। নীলদ্বীপে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু মুসলমান সংখ্যা কম। তবু মহারাজের গুণধর মন্ত্রী পরশু সিং-এর হুকুম, মুসলমানগণ দ্বারাই এ বাঁধ তৈরির কাজ সমাধা করতে হবে।

অন্যান্য দিনের মত আজও কাজ পুরাদমে শুরু হয়ে গেছে।

মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ-নারী কেউ বাদ যায়নি। সবাই যে যেমন পারে পাথর বহন করে চলেছে।

বনহুর হঠাৎ এসে দাঁড়ালো তার অশ্ব নিয়ে। দেহে জমকালো ড্রেস, মাথার পাগড়ী দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। কোমরের বেল্টে রিভলভার, পাশেই খাপের মধ্যে ছোরা। অশ্বপৃষ্ঠে বসে সে তাকালো সম্মুখের দিকে। দেখলো, পূর্বদিনের সেই বৃদ্ধ আজও পাথর বহন করে চলেছে। সমস্ত রাত্রির ক্লান্তি এখনও জড়িয়ে আছে তার সমস্ত দেহ এবং মুখে। পাথর বহন করে নিয়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে বৃদ্ধের তবু চলেছে সে মন্থর গতিতে, শিথিল দু'খানা পায়ের উপর দেহটা যেন দুলছে ওর।

হঠাৎ একটা হোচট খেয়ে পড়ে গেলো লোকটা। পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ায় ঠোঁট দু-টো কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন রাজকর্মচারী দ্রুত এগিয়ে এলো চাবুক হস্তে। কোনোরকম দ্বিধা না করে চাবুক দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলো তার পিঠে।

বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলো—উঃ!

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় চাবুক এসে পড়লো।

এরপর চাবুক উঁচু হতেই রাজকর্মচারীর হাতখানা চাবুক সহ আটকে গেলো শূন্যে। বিস্ময় নিয়ে ফিরে তাকালো রাজ কর্মচারী, চোখ দুটো তার স্থির হয়ে গেলো একেবারে। দেখলো, জমকালো পোসাক পরা একটি লোক চাবুকসহ তার ডান হাতখানা ধরে ফেলেছে। মুহূর্ত বিলম্ব হলো না, চাবুকখানা রাজকর্মচারীর হাত থেকে এক ঝটকায় কেড়ে নিলো বনহুর, তারপর প্রচণ্ডভাবে তার দেহে আঘাতের পর আঘাত করে চললো।

সেকি ভীষণ আঘাত।

রাজকর্মচারীর পরিধেয় বস্ত্র সে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। দেহের চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হতে লাগলো তার।

নিমিষে এই কাণ্ড ঘটে গেলো।

চারিদিক থেকে অন্যান্য রাজকর্মচারী ছুটে এলো, কিন্তু ততক্ষণে আহত রাজকর্মচারীর নাকেমুখে রক্ত বেরিয়ে আসছে গড় গড় করে। চাবুকের প্রচণ্ড আঘাতে তার হৃৎপিন্ড ফেটে গিয়েছিলো, মুখ দিয়ে রক্তের ফিনকি ছুটলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো।

ততক্ষণে বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছে।

রাজকর্মচারিগণ শুধু দেখলো, একটা জমকালো পোসাক পরা লোক অশ্বপৃষ্ঠে উল্কাবেগে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কেউ জানলো না বা বুঝলো না কে সেই লোকটি।

পরদিন মন্ত্রিসভায় যখন এ ব্যাপার নিয়ে ভীষণ একটা আলোড়ন চলছিলো তিলক বসেছিলো মন্ত্রী পরশু সিং-এর পাশে।

বাঁধ নির্মাণ স্থানে যেসব রাজকর্মচারী পাহারারত ছিলো তারা এক-একজন এক-একরকম উক্তি প্রকাশ করতে লাগলো।

এক রাজকর্মচারী এসে পরশু সিং-এর সম্মুখে দাঁড়ালো, চোখেমুখে তার ভীতির লক্ষণ, ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো—মন্ত্রীবর, সে এক অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ভোর হয়ে গেছে, বাঁধ তৈরির কাজ চলেছে, এমন সময় হঠাৎ একজন কালো পোসাক পরা যমদূতের মত লোক অশ্বপৃষ্ঠে সেখানে আবির্ভূত হলো এবং আচমকা আমাদের লোকটার উপর হামলা চালালো......

বাঁধ তৈরির ব্যাপারে মহারাজ হীরন্ময় সেন সমস্ত দায়িত্বভার মন্ত্রী পরশু সিং-এর উপর দিয়েছিলেন, তাই বাঁধ তৈরির ব্যাপারে যতকিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলতো মন্ত্রিসভায়। গতদিনের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা নিয়ে আজ মন্ত্রিসভা সরগরম হয়ে উঠেছে।

পরশু সিং গর্জন করে উঠলো—তোমরা তখন কোথায় গিয়েছিলে? যতসব গর্দভের দল।

আর একজন বললো—হুজুর, আমরা হতবাক হয়ে পড়েছিলাম। সেকি ভয়ঙ্কর শক্তিমান কালো মূর্তিটি......

চুপ করো, ঐ এক কথা—কেন, তোমাদের হাতে কি অস্ত্র ছিলো না?

ছিলো হুজুর, কিন্তু......

এগুতে কেউ সাহস পাওনি, তাই না?

হাঁ হুজুর।

এবার মন্ত্রী পরশু সিং আনমনা হয়ে গেলো, গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে বললো—লোকটাকে তোমরা কেউ চিনতে পারলে না?

একসঙ্গে রাজকর্মচারীরা বলে উঠলো—না, আমরা কেউ তাকে চিনতে পারিনি।

অন্য একজন রাজকর্মচারী বলে উঠলো—মন্ত্রীবর, লোকটা যমদূতের মত যেমন দেখতে তার কাজও তেমনি, আমরা কেউ সেখানে এগুবার সাহস পাইনি।

হুঙ্কার ছাড়লো পরশু সিং-সাহস পাওনি! একটা লোককে মেরে ফেললো আর তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখলে? যতসব মেষ শাবকের দল! আর একজনকে লক্ষ্য করে এবার বললো পরশু সিং—বলো কি করছিলে তোমরা তখন?

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো সেই রাজকর্মচারীটি, কম্পিত কণ্ঠে বললো—মন্ত্রীবর, সে লোকটা মানুষ না রাক্ষস ঠিক বুঝতে পারিনি আমরা। হঠাৎ কোথা হতে এলো, ভীষণভাবে আক্রমণ করলো আমাদের একজনকে, চাবুকের আঘাতে মেরেই ফেললো তাকে।

অন্য একজন বলে উঠলো—আমরা এগিয়ে আসার আগেই সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর লোকটা ঘোড়ায় চেপে হাওয়ার বেগে কোথায় যে চলে গেলো, আর তাকে দেখতে পেলাম না......

এবার বললো তিলক—লোকটা নিশ্চয়ই যাদুকর হবে।

পরশু সিং বলে উঠলো— ঠিক বলেছেন রাজকুমার তিলক সেন, নিশ্চয়ই সে কোনো যাদুকর হবে, নাহলে হঠাৎ আবির্ভূত হলো, আবার কোথায় হাওয়ায় মিশে গেলো—সত্যি বড় আশ্চর্য ঘটনা। আচ্ছা, আজ তোমরা যাও, ঠিকভাবে কাজ পরিচালনা করবে। আবার যদি হঠাৎ সেই যাদুকর হানা দেয়, তোমরা তাকে ছেড়ে দিও না, বুঝলে? পরশু সিং কথাগুলো তার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো।

অনুচরদের একজন বললো—আচ্ছা হুজুর, আপনার আদেশমত কাজ করবো।

সেদিনের মত মন্ত্রিসভা ভংগ হলো।

তিলক উঠে দাঁড়ালো।

মন্ত্রী পরশু সিং সসম্মানে মাথা নত করে কুর্ণিশ জানালো।

তিলক একটু হেসে বিদায় গ্রহণ করলো।

ঘটনাটার খবর রাজপ্রাসাদেও এসে পৌঁছলো।

মহারাজ যখন ব্যাপারটা শুনলেন নীরব রইলেন, তিনি কোনো ভাল বা মন্দ জবাব দিলেন না।

মহারাণী এবং রাজকন্যা বিজয়ার মুখেও একটা ভীতি ভাব ফুটে উঠলো। এই তো সামান্য কিছুদিন পূর্বে তারা ভয়ঙ্কর কাপালিকের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, আবার না জানি কোন যাদুকরের আগমন ঘটলো কে জানে।

মহারাণী একসময় তিলকের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—বাবা তিলক, তুমি কোনো সময় অসাবধানে রাজপ্রাসাদের বাইরে যাবে না।

তিলক বলেছিলো—কেন মহারাণী?

তুমি শোনোনি বাবা সেই ভয়ঙ্কর যাদুকরের কথা? হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আমাদের একজন রাজকর্মচারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে?

শুনেছি মহারাণী। কিন্তু আমি তো কারও অন্যায় করিনি যে আমাকে সেই যাদুকর হত্যা করবে?

রাজকর্মচারী সেও তো কোনো অন্যায় করেনি বাবা? সে তো কাজ পরিচালনা করছিলো।

অন্যায় না করলে কেউ কাউকে হত্যা করে না মহারাণী। কারণ যাদুকর মানুষ, কাপালিক নয়।

বিজয়া এসে দাঁড়ায় সেখানে—যত কথাই বলো তিলক, তোমাকে রাতে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। অনেক সাধনা করে মা তোমাকে সন্তানরূপে পেয়েছেন।

হাসে তিলক।

পরদিন রাজকর্মচারিগণ কয়েকজন মুসলমান বন্দীকে হাতপায়ে শিকল বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে কারাগার অভিমুখে নিয়ে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ পূর্ব দিনের সেই জমকালো পোশাক পরা লোক আচমকা পথের মধ্যে আবির্ভূত হলো, মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজকর্মচারীদের উপর। প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো জমকালো পোশাক পরা লোকটা, এক এক আঘাতে এক-একজনকে ধরাশায়ী করতে লাগলো।

রাজকর্মচারীরা হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ পেলো না, কে কোন্ দিকে প্রাণ নিয়ে পালালো, তার ঠিক নেই।

জমকালো পোশাক পরা লোকের মুষ্টাঘাতে এক-একজনের নাকমুখ থেতলে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। কাউকে কাউকে গলা টিপে হত্যা করে ফেললো সে।

অল্পক্ষণেই বন্দীদের ছেড়ে রাজকর্মচারিগণ উধাও হলো।

বন্দীরা মুক্তি পেয়ে খোদার কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করতে করতে ফিরে গেলো নিজ নিজ আবাসে।

জমকালো পোশাক পরা লোক অশ্বপৃষ্ঠে চেপে উধাও হলো।

ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়লো নীল দ্বীপের সর্বত্র।

রাজকর্মচারীরা ধূলা বালি আর রক্তমাখা দেহে মন্ত্রী পরশু সিং-এর সম্মুখে এসে সব কথা জানালো।

যখন রাজকর্মচারীরা মন্ত্রীবরের সম্মুখে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলো তখন তিলক হাজির হলো সেখানে।

মন্ত্রী পরশু সিং বললো—রাজকুমার, শুনুন, আজ আবার সেই দুর্দান্ত যমদূত হানা দিয়ে আমাদের রাজকর্মচারীদেরকে আহত এবং নিহত করে বন্দীদের সবাইকে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্তি দিয়েছে।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো রাজকুমার তিলক সেন— আমি সেই সংবাদ শুনেই আসছি মন্ত্রীবর। কি ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী সেই ব্যক্তি। নাঃ, কিছুতেই তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়......

পরশু সিং বলে উঠলো—আমিও সেই কথা ভাবছি, কিন্তু কিভাবে তাকে শায়েস্তা করা যায়। লোকটা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত। আমাদের পঁচিশজনকে সে একাই কাবু করে উধাও হয়ে গেছে।

মন্ত্রীবর, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

অমন অশুভ মুহূর্ত এখনও আমার ভাগ্যে আসেনি।

অশুভ নয় মন্ত্রীবর, শুভ মুহূর্ত বলুন...

তিলকের কথায় অবাক হয়ে তাকালো মন্ত্রী পরশু সিং।

হেসে বললো তিলক—কারণ আপনার হাতে পড়লে সে যতবড় শক্তিশালী বীর পুরুষই হোক, নাকানি-চুবানি তাকে খেতেই হবে।

এবার পরশু সিং-এর মুখে হাসি ফুটলো, বললো সে—ঠিক বলেছেন রাজকুমার, সে কত দুর্দান্ত একবার আমার সম্মুখে এলে তাকে দেখে নেবো।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে তিলক।

মন্ত্রী পরশুর চোখে আবার বিস্ময় ফুটে উঠে, অবাক হয়ে তাকায় সে তিলকের মুখে।

তিলক হাসি বন্ধ করে বলে—আপনার হাতে পড়লে তার নিস্তার নেই কিছুতেই। ঠিক বলেছি কিনা মন্ত্রীবর'?

হাঁ, ঠিকই বলেছেন রাজকুমার।

পরশু সিং রাজকর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে বললো—তোমরা যাও। যতসব অক্ষম আর অপদার্থের দল! তোমরা যেভাবে কাজ চালাচ্ছিলে সেইভাবে কাজ চালাবে। আমি গিয়ে এবার বন্দীদের নিয়ে আসবো। দেখি কোন্ বেটা আমার সামনে আসে। যাও......

রাজকর্মচারিগণ'? এক-একজনকে ভেজা শেয়ালের মত মনে হচ্ছিলো, তারা সবাই পিছু হটে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

পরশু সিং বললো—এবার আমি যাবো, দেখবো কে সে!

সেটাই ভাল হবে মন্ত্রীবর।

তিলক মন্ত্রী প্রাসাদ হতে ফিরে এলো রাজপ্রাসাদে।

বিজয়া বাগানের পাশেই চিন্তিত মুখে অপেক্ষা করছিলো, তিলককে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো—তিলক, একটা আশ্চর্য খবর শুনেছো'?

কই না তো, আশ্চর্য খবর এমন কি'?

আজ আবার জমকালো পোশাক পরা সেই ভয়ঙ্কর লোকটা পথের মধ্যে হানা দিয়ে আমাদের বন্দীদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

এটা আবার এমন আশ্চর্য খবর কি'? হয়তো আমাদের রাজকর্মচারিগণ অন্যায়ভাবে কতকগুলো লোককে বন্দী করে নিয়ে আসছিলো, তাই...

তা কি পারে! আমাদের রাজকর্মচারিগণ অহেতুক কাউকে বন্দী করে নিয়ে আসতে পারে না। যারা বাঁধ তৈরি করতে নারাজ হয় কিংবা বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাদের বন্দী করে আনা হয়। যাক্ ওসব কথা, তুমি যেন কখনও বাঁধ তৈরির ওদিকে যেও না'?

উঁ হুঁ, মোটেই না। সত্যি, সেই জমকালো পোশাক পরা লোকটির কথা শুনলে আমার গা শিউরে উঠে যেন।

তিলকের কথা শুনে হাসে বিজয়া— এই সাহস নিয়ে তুমি কাপালিক হত্যা করেছো তিলক'?

তিলক চোখ দুটো গোলাকার করে বলে—কাপালিক হত্যা সে তো সামান্য ব্যাপার। এটা যে অদ্ভুত আর আশ্চর্য মানুষ। হাওয়ায় মিশে আসে.. আবার হাওয়ায় মিশে যায়।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না একটুও। মানুষ কখনও হাওয়ায় মিশে আসতে পারে, আবার হাওয়ায় মিশে যেতে পারে? সব মিছে কথা.. নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট দুঃসাহসী লোক হবে।

সর্বনাশ, তাহলে তো আরও ভয়।

কেন?

দুষ্ট লোক সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হয়, তারা যে কোনো অসাধ্য কাজ বিনা দ্বিধায় করতে পারে......

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো তিলক, এমন সময় মহারাণী এসে পড়েন সেখানে।

তিলক চলে যাচ্ছিলো।

মহারাণী বললেন—বাবা তিলক, যেও না, শোনো।

তিলক থমকে দাঁড়ালো।

বিজয়া মায়ের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

মহারাণী বললেন—তিলক, রাজ্যে নতুন একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। একদিন নয়, পর পর দু'দিন সেই জমকালো পোশাক পরা লোকের আবির্ভাব ঘটেছিলো। সে আবার রাজকর্মচারীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আমি সব শুনেছি রাণীমা।

বাবা, আমার যত ভয় আর ভাবনা তোমাকে নিয়ে। হঠাৎ তোমার উপর তার দৃষ্টি না পড়ে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রাণীমা, আমার উপর কোনোরূপ হামলা চালাতে সাহসী হবে না।

হাঁ বাবা, তাই আমিও চাই। তোমাকে হারালে আমি মরে যাবো তিলক।

তিলক হেসে বললো—কেন, বিজয়া আছে। তাছাড়া চিরদিন কি নীল দ্বীপে আমার থাকা সম্ভব রাণীমা?

না না, তোমাকে কিছুতেই আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যে আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের ধন। বিজয়া, ওর দিকে ভালভাবে খেয়াল রাখিস মা।

সে তোমাকে বলতে হবে না মা, আমি সব সময় ওর প্রতি খেয়াল রাখবো।

মহারাণী চলে গেলেন।

তিলক মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললো—বিজয়া, তোমরা দেখছি আমাকে একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছো।

চুপ করো তিলক, মায়ের আদেশ অমান্য হবার নয়।

কি করতে হবে?

আজ থেকে বাইরে যাওয়া তোমার চলবে না।

সর্বনাশ, কেন?

ঐ তো মায়ের আদেশ।

মানে?

মানে তোমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে।

যেন না হারিয়ে যাই?

তা নয়।

তবে?

মার ভয় সেই দুষ্ট ভয়ঙ্কর লোকটা যদি..

আমাকে হত্যা করে, এই তো?

হঁ।

সত্যি, আমারও বড্ড ভয় করছে, কিন্তু......

কিন্তু আবার কি?

সব সময় কি আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকা যায়?

সেকি, প্রাসাদে বন্দী থাকবে কেন? বাগান রয়েছে, ঝর্ণার ধার রয়েছে, দীঘি রয়েছে—যখন যেখানে খুশি বেড়াবে, শুধু প্রাসাদের বাইরে যেতে পারবে না।

আর তুমি থাকবে আমার পাশে পাশে।

হাঁ, থাকবো।

তাহলেই তো হয়েছে।

কেন, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না?

হয়, খুব হয়, তবে......

বলো?

তবে আমার মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে।

আর আমার মনে কি হয় জানো?

কি?

সব সময় তোমাকে এমনি করে জড়িয়ে রাখি দুটি বাহু দিয়ে......বিজয়া তিলককে জড়িয়ে ধরে আলগোছে।

তিলক বলে উঠে—কেউ দেখে ফেলবে বিজয়া।

রাজকন্যা বিজয়ার সেজন্য ভয় পবার কিছু নেই, দেখলেই বা।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি তীর এসে গেঁথে যায় মাটিতে তিলকের পায়ের কাছে।

বিজয়া হাত দু'খানা মুক্ত করে নিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তীরখানার দিকে তাকালো।

তিলক তুলে নিলো তীরটা হাতে—আশ্চর্য, আজ তীরফলকে কোনো কাগজ গাঁথা নেই। তাকালো সে আনমনে সামনের দিকে, বুঝতে পারলো তিলক আশা তাকে বিজয়ার কবল থেকে রক্ষা করে নিলো। একটু হাসলো তিলক।

বিজয়া অবাক কণ্ঠে বললো—আচ্ছা তিলক, মাঝে মাঝে এভাবে কোথা থেকে তীর আসে—কই, কোনো দিনতো তুমি আমাকে বললে না? আমি লক্ষ্য করেছি, তীরফলক এলেই তুমি কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়ো?

আমি নিজেও জানি না কোথা থেকে এ তীরফলক আসে আর কেই বা নিক্ষেপ করে। আমি বুঝতে না পেরে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। যাক সে কথা, চলো এবার যাওয়া যাক।

পা বাড়ালো তিলক আর বিজয়া প্রসাদের অভ্যন্তরের দিকে।

❑

মরিয়ম বেগম সব সময় চিন্তিতভাবে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর মনের মধ্যে সদা-সর্বদা ঐ একটি কথা উঁকিঝুঁকি মারছে, এতদিনেও তাঁর মনির এলো না কেন? নিশ্চয়ই কোনো শয়তানী তার সন্তানকে জোর করে আটকে রেখেছে। সব সবময় পুত্রের কথা স্মরণ করে তিনি চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

মনিরা কোনোরূপ সান্ত্বনা দিতে পারলো না, কারণ সে নিজেই এ জন্য দায়ী। স্বামীকে নীল দ্বীপে পাঠিয়ে তারও কি কম দুশ্চিন্তা। কিন্তু কি করবে সে, একদিকে শাশুড়ীর বিষণ্ন মুখ অন্য দিকে নূরের সাদা প্রশ্ন, তার আব্বু কবে আসবেন, কোথায় গেছেন, কেন গেছেন, এমনি নানা কথা।

মনিরা প্রতীক্ষা করতে থাকে রহমানের; রহমান এলে তার কাছে সংবাদ জানতে পারবে কিছু।

কান্দাই শহরে মনিরা যখন বনহুরের জন্য অস্থির চিত্ত নিয়ে দিন কাটাচ্ছে তখন কান্দাই জঙ্গলে বনহুরের প্রতীক্ষায় তার অনুচরগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে নূরী বেশি চঞ্চল হয়ে পড়েছে, তার হুর আজও ফিরে আসছে না কেন নীল দ্বীপ হতে?

রহমান তাকে অনেক করে বুঝাতে লাগলো।

বিশেষ করে নূরী কচি জাভেদের দিকে বেখেয়ালী হয়ে পড়লো, তার চিন্তা হুরের জন্য। কেন সে আসছে না, অমঙ্গল কিছু ঘটেনি তো? হুর কোথাও গিয়ে বহুদিন কাটায় না, এবার কেন সে এতদিন নীরব রয়েছে কে জানে।

একদিন নূরী গভীর রাতে ঘুমন্ত জাভেদকে নাসরিনের শয্যায় শুইয়ে রেখে অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, নীল দ্বীপ কোথায় সেই খোঁজে।

অশ্ব নিয়ে ছুটে চললো নূরী, ভুলে গেলো সে স্নেহের জাভেদের কথা। ভুলে গেলো সঙ্গী-সাথীদের কথা। শুধু তার মনে এক চিন্তা—কোথায় সেই নীল দ্বীপ যেখানে তার বনহুর রয়েছে।

বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সব ছেড়ে এগিয়ে চললো নূরী।

ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো তবু সেদিকে খেয়াল নেই, চলেছে সে একমনে। কিন্তু ক'দিন না খেয়ে কাটানো যায়, অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লো নূরী। ঝর্ণার পানি পান করে, কখনও বা বন থেকে ফল সংগ্রহ করে খেয়ে জীবন বাঁচাতে লাগলো।

কিন্তু নীল দ্বীপ কোথায় তা তো নূরী জানে না।

সে দিনরাত অশ্ব নিয়ে এগিয়ে চললো।

ওদিকে নাসরিন সেদিন ঘুম থেকে জেগেই পাশে জাভেদকে দেখে আশ্চর্য হলো, এত রাতে জাভেদ কি করে তার শয্যায় এলো? দিনের বেলা হলে ভাববার কিছু ছিলো না, কারণ অনেক দিন নূরী জাভেদকে সখ করে নাসরিনের শয্যায় ওর পাশে শুইয়ে দিয়ে যেতো। নাসরিন স্বামীকে ডেকে বললো—দেখো দেখো, জাভেদ কি করে আমার বিছানায় এলো।

রহমান চোখ রগড়ে বললো—তাই তো, এত রাতে জাভেদ এখানে কেন?

নাসরিন জাভেদকে কোলে নিয়ে নূরীর কক্ষের দিকে ছুটলো......কিন্তু কোথায় নূরী, শুন্য কক্ষ খাঁ খাঁ করছে।

সমস্ত আস্তানায় নূরীর সন্ধান চললো, কোথাও সে নেই। পরে অশ্বশালায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো, একটি অশ্ব নেই। এবার সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, নূরী জাভেদকে নাসরিনের কাছে সঁপে দিয়ে উধাও হয়েছে।

রহমান ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লো, নূরী সকলের অজান্তে গেলো কোথায়? নিশ্চয়ই সে সর্দারের খোঁজে গেছে পাবে সে সর্দারকে। নীল দ্বীপ সে বহুদূরে সমুদ্রের ওপারে, সেখানে নূরী যাবে কি করে?

রহমান দরবারকক্ষে অনুচরদের ডেকে সবাইকে জানিয়ে দিলো. নূরী কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে. তারা সবাই যেন নূরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

রহমান নিজেও নিশ্চুপ থাকতে পারলো না. সেও নূরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো।

নাসরিন জাভেদকে নিয়ে মেতে উঠলো। ওর নাওয়া-খাওয়া. দোলনায় দোলা দেওয়া. কোলে করে ঘুম পাড়ানো. এ সব নিয়ে সে ব্যস্ত। জাভেদ কচি শিশু. তাই সে মাকে তেমন করে বুঝতে শেখেনি. নাসরিনের আদর-যত্নে সে বিভোর হয়ে পড়লো।

অবশ্য প্রথম প্রথম মাকে না পেয়ে কাঁদাকাটা শুরু করেছিলো জাভেদ। কিন্তু বেশি সময় লাগেনি তাকে ভোলাতে নাসরিনের।

বনহুরের অনুচরগণ যে যেদিকে পারলো নূরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

রহমানও অশ্ব নিয়ে খোঁজ করে চললো বন-জঙ্গল সব জায়গায়। ক'দিন অবিরত খোঁজ করেও নূরীর কোনো সন্ধান পেলো না তারা। ফিরে এলো এক এক করে সবাই।

রহমানও ফিরে এলো হতাশ মন নিয়ে।

নাসরিন জাভেদকে কোলে করে ছুটে গেলো স্বামীর পাশে, স্বামীর উস্কোখুস্কো ম্লান মুখ দেখে সে বুঝতে পারলো সব, তবু ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—নূরীকে পেলে না?

রহমান একটা আসনে বসে পড়ে বললো—না!

তবে জাভেদের কি হবে?

তুমিই ওর ভার নাও নাসরিন, যতদিন নূরী ফিরে না আসে......

এদিকে যখন নূরীর সন্ধানে সবাই ব্যস্ত তখন নূরী সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছে গেছে। অশ্ব ত্যাগ করে জাহাজে উঠে পড়ে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে। সে অন্যান্যের কাছে জেনে নেয়, এ জাহাজখানা নীল দ্বীপ অভিমুখে যাচ্ছে।

রুক্ষ চুল। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, চোখমুখ বসে গেছে একেবারে। ঠিকমত খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, ঘুমানো নেই, পাগলিনীর মত হয়ে পড়েছে।

জাহাজের যাত্রিগণ সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ নূরীকে লক্ষ্য করলো না। নূরী জাহাজের ডেকে একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো। তাকে যেমন করে হোক যেতেই হবে সেই নীল দ্বীপে, তার হুরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

জাহাজ যখন মাঝসমুদ্রে তখন জাহাজের একজন খালাসীর চোখে পড়ে গেলো নূরী। সেই খালাসি খাবার রেখে ওদিকে গিয়েছিলো কিছু আনতে, সেই মুহূর্তে নূরী ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে খালাসীর খাবারগুলো টেনে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

খালাসি এসে দেখে অবাক, কে এই নারী—পাগলিনী না কি! ওকে ধরে নিয়ে গেলো সে ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেনও দেখে অবাক।

নূরীকে পাগলী মনে করে তারা বন্দী করে রাখলো, মনে করলো ছাড়া থাকলে নানা রকম গণ্ডগোল করতে পারে।

❑

প্রতিদিন এইভাবে অকস্মাৎ হানা দিয়ে দু'চারজন করে রাজকর্মচারী হত্যা চললো। কে সেই জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তি—কেউ তাকে ধরতে পারে না, কেউ তার দেহে অস্ত্র নিক্ষেপ করবার পূর্বেই দ্রুত অশ্ব নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

নীলদ্বীপবাসী যখন এই ব্যক্তিকে নিয়ে ভীষণ একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো তখন ও মহারাজ হীরন্ময় নিশ্চুপ, তিনি এ ব্যাপরে কোনোরকম মতামত ব্যক্ত করেন না। আজকাল যেন বোবা বনে গেছেন তিনি।

বাঁধ নির্মাণ কাজ অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, আরও ক্ষতি হতে লাগলো। রাজকর্মচারিগণ কেউ আর বাঁধ নির্মাণ স্থানে পাহারারত থাকতে রাজি নয়। বিদ্রোহ দেখা দিলো তাদের মধ্যে।

কিন্তু মুসলমানদের আনন্দ আর ধরে না। এ পর্যন্ত সেই কালো মূর্তি মুসলমানদের কাউকে হত্যা করেনি বা কারও উপর নির্যাতন চালায়নি!

সেদিন পরশু সিং মহারাজের দরবারে হাজির হয়ে জানালো—মহারাজ, কাপালিকের কবল থেকে দেশবাসী রক্ষা পেলো বটে কিন্তু আর একটি ভয়ঙ্কর জীবের অত্যাচার শুরু হয়েছে। সে শুধু আমাদের লোককে হত্যা করে, মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করে না।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন মহারাজ—ভয়ঙ্কর জীব সে কেমন?

মহারাজ, জীবটি পশু বা জানোয়ার নয়—মানুষ।

এবার মহারাজ হেসে উঠলেন, ব্যঙ্গপূর্ণ সে হাসি।

পরশু সিং অবাক হলো, সে বলে উঠলো—মহারাজ, আপনি হাসছেন যে?

মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন—হাসবো না তো কি কাঁদবো? পশু নয়, জানোয়ার নয়, একটি মানুষ আপনাদের এমনভাবে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে, আর আপনার বীর পুরুষের দল শুধু হাবা-গোবা হয়ে দেখেই যাচ্ছেন। যান, ওসব আমি শুনতে চাই না।

মহারাজ, সব দোষ মুসলমানদের।

না।

সেই ব্যক্তি মুসলমানের পক্ষ হয়ে আমাদের লোকজনদের এভাবে প্রহার এবং হত্যা করে চলেছে। এখন রাজকর্মচারিগণ আর সেই স্থানে যেতে রাজি নয়। মহারাজ, বাঁধ তৈরির কাজ এবার বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

তাই হোক, বাঁধ তৈরির কাজ বন্ধ করে দিন।

মহারাজ, বলেন কি। বাঁধ তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে সমস্ত নীলদ্বীপ যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবে শুধু মুসলমান নয়, নীলদ্বীপবাসী সবাইকে বাঁধ তৈরির কাজে নিযুক্ত করুন, দেখবেন সব সমস্যা চুকে যাবে।

মহারাজের কথায় মন্ত্রী পরশু সিং খুশি হতে পারলো না, বরং মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। মহারাজের কি ভীমরতি হয়েছে যে, এতগুলো মুসলমান দেশে থাকতে তাদের বসিয়ে রেখে হিন্দুদের দ্বারা বাঁধ তৈরির

কঠিন কাজ করাবেন। বুড়ো হলে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়, তাই মহারাজের মাথাও গুলিয়ে গেছে। মহারাজের মতামতের অপেক্ষা না করে পরশু সিং চলে গেলো সেখান থেকে। সোজা সে গিয়ে হাজির হলো রাজকুমার তিলকের কাছে।

তিলক তখন তার বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম করছিলো।

পরশু সিং এসে কুর্ণিশ জানালো তিলক কুমারকে।

তিলক অসময়ে তার কক্ষে মন্ত্রী পরশু সিংকে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেও মুখোভাবে প্রকাশ না করে বসার জন্য অনুমতি দিলো—বসুন মন্ত্রীবর।

পরশু সিং আসন গ্রহণ করলো, তারপর বললো—রাজকুমার, একটা পরামর্শের জন্য এলাম।

তিলক শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো, সোজা হয়ে বসে বললো—বলুন?

মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিসুদ্ধি ও সব তাঁর বুড়িয়ে গেছে।

কি ব্যাপার মন্ত্রীবর?

ব্যাপার অত্যন্ত দুঃখজনক।

বলুন?

মহারাজকে আমি সেই দুষ্কৃতিকারী সম্বন্ধে সব বলায় তিনি বললেন—মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ না করে নীলদ্বীপের হিন্দুগণ দ্বারা বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করে দিন। বলুন, তাঁর মাথা ঠিক আছে কি?

তিলক বললো—হুঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।

কুমার, আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন তবে আমি সব করতে পারি! কে সেই শয়তান জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, তাকেও আমি দেখে নেবো, আর......

বলুন, থামলেন কেন?

আর বাঁধ তৈরির কাজ চলবে এবং সে কাজ মুসলমানদের দিয়েই করাবো।

মহারাজের হুকুম আপনি অমান্য করবেন মন্ত্রীবর? জানেন এটা চরম দোষণীয়?

তিলক, তুমি আজ রাজকুমার হয়েছো, কিন্তু আসলে তুমি ভীল-সন্তান। তোমার কথাবার্তা কিন্তু ভীল-সন্তানের মত নয়।

নয় বলেই তো মহারাণী আমাকে নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া মহারাজও আমাকে জেনেশুনেই কুমারের স্থানে বসবার অনুমতি দিয়েছেন।

তিলক, মহারাজ বৃদ্ধ, তাঁর সমস্ত বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তিনি যা করবেন সেটাই যে রাজ্যের মঙ্গলজনক তা নাও হতে পারে, কাজেই......

কাজেই আপনি কি করতে চান মন্ত্রীবর?

আমি চাই মহারাজকে বন্দী করে......

আপনি মহারাজকে বন্দী করতে চান?

হাঁ, তাকে পাগল বলে প্রজাদের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

চমৎকার বুদ্ধি।

হাঁ, বুদ্ধি আছে বলেই তো আজও টিকে আছি। তিলক, তুমি যদি চিরদিনের জন্য রাজকুমার হয়ে রাজপ্রাসাদে থাকতে চাও তাহলে আমার কাজে বাধা দিও না বা বাধা দিতে চেষ্টা করো না।

বরং আপনাকে সহায়তা করতে পারি, এই তো?

হাঁ, বুঝেছো দেখছি। তিলক, তুমি যা চাও তাই পাবে, রাজকন্যা বিজয়াকেও পাবে, শুধু আমাকে সহায়তা করবে। বুদ্ধিহীন রাজাকে আর রাজ-সিংহাসনে বসাতে চাই না।

তিলক একটু হেসে বললো—যা বলবেন তাই হবে।

বেশ, আমার কথামত কাজ করবে, কেমন?

হাঁ, করবো।

পরশু সিং চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর বললো আবার—আগামী সপ্তাহের শেষ দিন আমি মহারাজকে বন্দী করবো, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

নিশ্চয়ই করবো, কিন্তু......

কিন্তু কি, বলো তিলক?

আমাকে আপনি সর্বক্ষণ পাশে রাখবেন তো?

তুমিই আমার ডান হাত হলে তিলক। তোমাকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ করবো না।

এ কথা যেন ভুলে যাবেন না মন্ত্রীবর।

না না, ভুলবো না, কিছুতেই না। পরশু সিং উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ কি মনে করে আবার বসে পড়লো সে, বললো—তিলক, আজ রাতে আমি

নিজে যাবো সেই বাঁধ তৈরির স্থানে। যে বন্দীদের সেদিন ছিনিয়ে নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়েছিলো তাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে আসবো।

বললো তিলক—তারপর?

তারপর বন্দী মুসলমানদের হাত-পা বেঁধে তাদের সবাইকে ছোরা বিদ্ধ করে হত্যা করবো।

চমৎকার!

আরও চমৎকার আজ দেখে নেবো সেই দুর্দান্ত ব্যক্তিটিকে, দেখবো কত শক্তি আছে তার দেহে!

মন্ত্রীবর, আপনি সত্যি অসীম শক্তিবান। না জানি কি উপায়ে আপনি সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে কাবু করবেন?

জানো দেয়ালেরও কান আছে।

জানি কিন্তু......

তবু জানতে চাও?

হাঁ।

পরে বলবো, এখন নয়। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো। পরশু সিং।

তিলক মৃদু হেসে শয্যা গ্রহণ করলো।

রাত গভীর।

মুসলমানদের বন্দী করে নিয়ে আসার জন্য পরশু সিং সজ্জিত হয়ে নিলো। অন্যান্য অনুচরকে সে যেভাবে শিখিয়ে রেখেছে তারা সেইভাবে তৈরি হয়ে নিয়েছে, মন্ত্রীবরের অপেক্ষায় আছে তারা।

মন্ত্রীবর পরশু সিং পোশাক পরে যেমন তার তরবারিটা তুলে নিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পিঠে ঠান্ডা এবং শক্ত কিছু অনুভব করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলো একটা গম্ভীর কঠিন কণ্ঠস্বর—অস্ত্র স্পর্শ করো না।

পরশু সিং-এর হাতখানা অস্ত্র স্পর্শ করতে গিয়ে থেমে পড়লো, ফিরে তাকালো সে পিছন দিকে। চোখ দুটো তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো......জমকালো পোশাক পরিহিত সেই ব্যক্তি, যাকে দেখার সৌভাগ্য আজও তার হয়নি, শুধু শুনেছে তার বর্ণনা আর দেখেছে তার কার্যের নির্মম পরিণতি। শিউরে উঠলো পরশু সিং, মুখখানা দেখা না গেলেও চোখ দুটো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে যেন ঐ দুটি চোখে।

পরশু সিং একচুল নড়বার সাহস পেলো না।

জমকালো পোশাক পরা লোকটি পরশু সিং-এর পিঠে ছোরাখানা ঠিক রেখে পা দিয়ে আঘাত করে টেবিল থেকে তরবারিখানা দূরে ফেলে দিলো, তারপর বললো—জানো আমি কেন এসেছি?

তা আমি কেমন করে জানবো? ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললো পরশুসিং।

জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি বললো—তবে শোনো, তুমি যাদের বন্দী করতে যাচ্ছিলে তাদের মুক্তি নিয়ে আমি এসেছি।

কে তুমি?

আমি তোমাদের অতি পরিচিত। একবার নয়, কয়েক বার আমি তোমাদের রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি......এবার এসেছি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে।

কি চাও আমার কাছে?

তুমি কোন্‌টা চাও তাই জানতে এসেছি—নীল দ্বীপের মুষ্টিময় মুসলমানদের রেহাই দেবে, না জীবন দেবো বলো? কোন্‌টা তুমি চাও?

পরশু সিং-এর চোখেমুখে ভয়, বিস্ময়, কম্পিত কণ্ঠে বললো—তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও?

হ্যাঁ, কিন্তু আমার কথা যদি রাখো তবে তুমি জীবন ভিক্ষা পাবে। মুসলমানদের প্রতি কোনোরকম অত্যাচার তুমি করতে পারবে না।

বেশ, তাই হবে।

শপথ করলে তো?

হ্যাঁ, শপথ করলাম।

যাও, এবার অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নাও।

পরশু সিং দ্রুত ঝুকে তরবারিখানা হাতে তুলে নিয়ে ফিরে তাকালো, বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগলো তার দুচোখে...কই, কোথায় সেই জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তি? লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

পরশু সিং-এর সব উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে গেলো, রাগে-ক্ষোভে সে পায়চারী করতে লাগলো।

ওদিকে রাজকর্মচারীরা যারা তৈরি হয়ে মন্ত্রীবরের জন্য অপেক্ষা করছিলো তারা উদগ্রীব হয়ে উঠলো। সেনাপতি স্বয়ং এসে হাজির হলো মন্ত্রী পরশু সিং-এর কক্ষে, কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—মন্ত্রীবর, আপনার বিলম্ব দেখে আমি এলাম।

পরশু সিং-এর মুখ কালো হয়ে উঠেছে, একটা ক্রোধ এবং প্রতিহিংসামূলক ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে, অধর দংশন করছিলো সে বারবার। সেনাপতি আসতেই তার মনে সাহস দেখা দিলো। একটু পূর্বের শপথের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো সে। ভুলে গেলো সেই জমকালো পোশাক পরা লোকটির কথা, সেনাপতিসহ বেরিয়ে এলো সে যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো তার অনুগত অনুচরগণ।

যেভাবে পূর্বে প্রস্তুতি নিয়েছিলো সেইভাবেই কাজ করলো পরশু সিং। ভোর হবার পূর্বেই হানা দিয়ে মুসলমানদের বন্দী করে নিয়ে এলো রাজ-কারাগারে।

এবার পরশু সিং-এর আনন্দ আর ধরে না। কারণ কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি তাকে কোনোরকম বাধা দেয়নি বা দেবার সাহস পায়নি।

পরশু সিং ইচ্ছামত শাস্তি দিতে লাগলো মুসলমান বন্দীদের। লৌহশিকলে আবদ্ধ করে এক-একজনকে ঝুলিয়ে রাখা হলো বন্দীশালায়।

নানাভাবে এইসব বন্দীর উপর নির্যাতন চললো। মুসলমানদের অপরাধ, তারা বাঁধ তৈরির ব্যাপারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। আরও অপরাধ, তারা জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তির কোনো পরিচয় দেয়নি।

পরশু সিং-এর সন্দেহ সেই অদ্ভুত ব্যক্তি মুসলমানদেরই মধ্যের কোনো যুবক—যে অসাধ্য সাধন করে চলেছে, যে দুঃসাহসী পরপর কয়েকজন রাজকর্মচারীকে হত্যা করেছে।

পরশু সিং কারাগারে বন্দীদের দেহে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো—বলো কে সেই ব্যক্তি যে আমাদের রাজকর্মচারীদেরকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করে চলেছে, জবাব দাও?

নিরীহ মুসলমানগণ কেমন করে জবাব দেবে, তারা নিজেরাই জানে না কে সেই জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি। আর্তকণ্ঠে বলে উঠে তারা—জানি না, আমরা জানি না।

নরপিশাচের মত মুখোভাব বিকৃত করে পরশু সিং বলে উঠে—জানো না? মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা, দাও অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে দাও ওদের দেহে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো একজনের মাংস মধ্যে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো বন্দী মুসলমান লোকটি।

সহসা পরশু সিং কাঁধে একটি বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়া অনুভব করে চমকে ফিরে তাকায়, মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। সেই জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তির অগ্নিচক্ষু দুটি তার হৃৎপিন্ডকে যেন ছিদ্র করে দেয়।

জমকালো মূর্তির হস্তের সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা তার পিঠে ঠেকে আছে আলগোছে। একটু নড়লেই সমূলে প্রবেশ করবে তার পিঠের মধ্যে।

জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে সেই বন্দীশালার পাহারাদারগণ আরষ্ট হয়ে গেছে যেন, সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি—মন্ত্রীবর, তোমার শপথ রক্ষা করেছো না? জবাব দাও?

পরশু সিং ঢোক গিললো। তার সামান্য কয়েকজন সঙ্গী এখানে কারাকক্ষে রয়েছে, তারাও তেমন সাহসী বীর পুরুষ নয়। নিজকে অসহায় মনে হচ্ছে মন্ত্রীবরের। সে জানে, এ ব্যক্তি কত সাংঘাতিক, এই মুহূর্তে ওর হস্তস্থিত ছোরাখানা তার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে হৃৎপিন্ডে পৌঁছতে পারে। জীবন্ত যমদূত যেন তার কাঁধে হাত রেখেছে। পরশু সিং কোনো জবাব দিতে পারলো না।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি—তোমার সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে মন্ত্রীবর। তুমি মুসলমানদের ধ্বংস করে নীলদ্বীপবাসিগণকে নিজের আয়ত্তে আনতে চাও। মহারাজকে পাগল সাব্যস্ত করে বন্দী করতে চাও। তারপর মহারাজকে হত্যা করে সিংহাসনে উপবেশন করতে চাও......

কে, কে তোমাকে এসব কথা বলেছে?

লুকোতে চাইলেই কথা চাপা থাকে না মন্ত্রীবর।

আমি তিলকের কাছে সব বলেছিলাম, নিশ্চয়ই তিলক সব তোমাকে বলেছে?

হাঁ, তিলককে তুমি আরও অনেক কিছু বলেছো। তাকে তার বংশ পরিচয়ের দুর্বলতায় কাবু করে নিজের বশে আনতে চেষ্টা করেছো। তাকে হাতের মুঠায় নিয়ে রাজ সিংহাসন দখল করবার চেষ্টা চালাচ্ছো......

হাঁ চালাচ্ছি, কারণ মহারাজ বৃদ্ধ, অক্ষম, তাই......

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ হীরন্ময় সেন এবং কিছুসংখ্যক সৈন্য অস্ত্র এবং লৌহশিকল হস্তে কারাকক্ষে প্রবেশ করে।

পরশু সিং-এর মুখ কালো হয়ে উঠলো মুহূর্তে।

মহারাজ হীরন্ময় সেন বললো—বন্দী করো এই নরাধম মন্ত্রীবরকে আর ওর অনুগত দাসদের।

সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকগণ রাজ আদেশ পালন করলো। পরশু সিং এবং তার অনুগত অনুচর যারা ঐ কারাকক্ষে ছিলো তাদের বন্দী করে ফেললো।

এবার জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নিজ মুখের কালো আবরণ উন্মোচন করে ফেললো।

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো পরশু সিং—তিলক।

হাঁ, আমিই তিলক।

পরশু সিং এবার বন্ধন অবস্থায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠলো—মহারাজ, এই সেই ব্যক্তি যে আমাদের অনেকগুলো রাজকর্মচারীকে হত্যা করেছে।

পরশু সিং-এর কথায় মহারাজের মুখেচোখে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা দিলো না। তিনি স্বাভাবিক এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমি সব জানতাম।

আপনি সব জানতেন তবু তাকে .....

হাঁ মন্ত্রীবর, যে অপরাধী, তাকে শাস্তি দিলে আমি কোনোদিনই তার বিরুদ্ধাচরণ করবো না। তিলক অপরাধীর শাস্তি দিয়েছিলো মাত্র।

মহারাজ!

হাঁ, যেমন আপনার অপরাধের জন্য আপনি বন্দী হলেন এবং এরজন্য আপনাকে চরম শাস্তিও পেতে হবে।

পিছন ফিরে তাকাতেই মহারাজ অবাক হলেন, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে মহারাণী আর বিজয়া। তারা বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে জমকালো পোশাক পরা তিলকের দিকে।

পরবর্তী বই

নূরীর সন্ধানে

নূরীর সন্ধানে—৫২

❑

মহারাজা হীরন্ময় সেন রাণীকে লক্ষ্য করে বললেন—তুমি যাকে নিজ সন্তানরূপে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও সে সাধারণ মানুষ নয়।

রাণী অবাক কণ্ঠে বললেন—তুমি তিলকের কথা বলছো?

হাঁ রাণী। একটু থেমে বললেন মহারাজ—তিলকের কাজ শেষ হয়েছে, আর তাকে তুমি ধরে রাখতে পারবে না।

একি বলছো তুমি মহারাজ?

হাঁ, তিলক এবার বিদায় নেবে।

না, না, আমি তাহলে বাঁচবো না। তিলককে ছাড়া আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো, বলো?

রাণী, কে সে—জানো?

জানি, সে ভীল সন্তান......

না, সে ভীল সন্তান নয়।

তবে কি তার পরিচয়?

তার পরিচয় তুমি জানতে চাও রাণী?

হাঁ, বলো? বলো আমি তিলকের পরিচয় জানতে চাই? বলো মহারাজ।

তিলক বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর!

মহারাণীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠে, পাথরের মূর্তির মত যেন জমাট বেঁধে যান তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, পিতার কথাগুলো তার কানে পৌঁছতেই সে যেন আরষ্ট হয়ে গেলো। তিলক দস্যু বনহুর—বিশ্ববিখ্যাত দস্যু! একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো বিজয়া। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে স্থবিরের মতো। তার মনে তখন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে মনে। এমন সুন্দর যার চেহারা,. এমন পৌরুষদীপ্ত যার কণ্ঠস্বর, গভীর উজ্জ্বল নীল যার দুটি চোখ, যার আচরণে নেই কোনো কুৎসিত লালসার ইংগিত, সেই কিনা স্বয়ং দস্যু বনহুর। বিজয়ার যেন বিশ্বাস হতে চায় না পিতার কথাগুলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলো বিজয়া, তারপর সে মনকে প্রস্তুত করে নিলো, পরীক্ষা করে দেখবে সে ঐ তিলককে—সত্যি সে দস্যু বনহুর কিনা।

ফিরে এলো বিজয়া নিজের ঘরে।

সুন্দর করে সাজলো সে। মুক্তাখচিত হারছড়া পরলো সে গলায়। কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে ঝকঝক করে উঠলো হারছড়া বিজয়ার কণ্ঠে। এ হার বহু মূল্যবান। সহসা এ হার বিজয়া পরতো না। কোনো রাজকীয় উৎসবে এ হার পরতো সে। তখন পাহারা পরিবেষ্টিত থাকতো তার চারপাশে। আজ বিজয়া হারছড়া পরে বিনা পাহারায় এগিয়ে চললো তিলকের কক্ষের দিকে।

বনহুর তখন নিজ কক্ষে শয্যায় শুয়ে একটি বই পড়ছিলো। গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ছে সে একটা অদ্ভুত কাহিনী। অন্যান্য দিনের মত আজও বিজয়া তিলকের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ালো আজ পা দু'খানা যেন তার আটকে গেছে দরজার ওপাশে। পিতার কণ্ঠস্বর ভাসছে তার কানের কাছে......তিলক স্বাভাবিক মানুষ নয়......সে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর! তিলক স্বাভাবিক মানুষ নয়......

বিজয়ার যেন বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা। দস্যু বনহুর—সে নাকি ভয়ঙ্কর এক দস্যু। তার দেহে নাকি অসুরের শক্তি। হিংস্র জন্তুর মত নাকি তার আকৃতি—কিন্তু তার চেহারায় তো নেই কোনো পশুত্বের ছাপ। বিজয়া অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বনহুরের দিকে।

হঠাৎ কি যেন মনে করে বিজয়া ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই দরজায় শব্দ হয়।

চমকে উঠে বনহুর, বই থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। বিজয়া চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে ডাকে সে—বিজয়া!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিজয়া।

বনহুর বলে—শোনো।

বিজয়ার মনে আজ এ কণ্ঠস্বর নতুন এক অনুভূতি জাগায়, ধীর-মন্থর গতিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে এগিয়ে আসে। চোখ দু'টি স্থির হয়ে আছে বনহুরের চোখের দিকে, বিস্ময় ঝরে পড়ছে তার দৃষ্টির মধ্যে।

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে—বিজয়া, কি দেখছো অমন করে?

তিলক তুমি......তুমি......

বলো?

তুমি, না না থাক......বিজয়া নিজকে সংযত করে নেয়। কারণ সে এসেছে তিলককে পরীক্ষা করে দেখবে সত্যি সে দস্যু কিনা। তাই তো সে এই মূল্যবান হারছড়া পরে এসেছে।

বিজয়া নিজকে স্বাভাবিক করে নিতে চেষ্টা করে। পূর্বে যে যেমন করে তিলকের সঙ্গে মিশতো তেমনি করে ঘনিষ্ঠভাবে সরে আসে সে, আজও মন থেকে সব দ্বিধা মুছে ফেলে, বলে—তিলক একটা কথা তোমায় বলবো, রাখবে?

রাজকন্যার কথা না রেখে পারি? বলো?

বিজয়া গলার স্বর চাপা করে নিয়ে বলে—শুনলাম বিশ্ববিখ্যাত-দস্যু বনহুর নাকি নীল দ্বীপে আগমন করেছে।

বনহুর চেহারায় ভীতিভাব ফুটিয়ে বলে উঠে—সত্যি বলছো বিজয়া?

বিজয়া বললো—হুঁ।

আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

বিজয়া মনে মনে হাসে, তিলকই যে স্বয়ং দস্যু বনহুর এ কথা জানতে বাকি নেই তার। অথচ বনহুর নিজেই যেন নিজ নাম শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। চমৎকার অভিনয় জানে সে। বিজয়া মনোভাব গোপন করে বলে—তিলক, তুমি বীরপুরুষ। একটি নয়, কতকগুলো ভয়ঙ্কর কাপালিককে তুমি হত্যা করেছো। তারপর মন্ত্রী পরশু সিং-এর মত একজন কুচক্রী শয়তানকে তুমি শায়েস্তা করেছো, আর দস্যু বনহুরের নামে তুমি এতোটুকু হয়ে গেলে?

বনহুর শয্যায় সোজা হয়ে বলে, মুখোভাবকে চিন্তাযুক্ত করে বলে উঠে—কাপালিক হত্যা, তারপর মন্ত্রী পরশু সিংকে শায়েস্তা করা—সে তো সামান্য ব্যাপার। দস্যু বনহুরকে কাবু করা—সেতো কম কথা নয়......

এমন ভীরু পুরুষ তুমি তিলক!

সত্যি আমি বড্ড ভীরু!

আর আমি এসেছি তোমার কাছে আমার একটি মূল্যবান জিনিস গচ্ছিত রাখতে।

তা—তা—খুব পারবো। কি জিনিস বিজয়া?

আমার এই হারছড়া। গলার হারছড়া হাতে খুলে নেয় বিজয়া, তারপর বলে—এই রাজপ্রাসাদে এটা আমি তোমার কাছেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করি।

ঢোক গিলে বলে বনহুর—এ যে অতি মূল্যবান হার।

সেজন্যই তো এত ভয়! দস্যু বনহুর যখন নীল দ্বীপে আগমন করেছে তখন রাজবাড়িতে একবার তার আগমন ঘটাবেই।

আমারও কিন্তু সেই রকম মনে হচ্ছে।

হারছড়া তোমার কাছেই থাক্, কেমন?

বেশ থাক্। তবে হঠাৎ যদি দস্যুটা আমার ঘরে হানা দিয়ে বসে?

আমার বিশ্বাস, তোমার সঙ্গে পারবে না—দস্যু বনহুরও নয়। তিলক, তুমি অদ্ভুত বীর পুরুষ!

বিজয়া, তোমার ধারণা যেন অক্ষুণ্ন থাকে।

বিজয়া হারছড়া বনহুরের হাতে দেয়, তারপর বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

❑

পরদিন বিজয়ার ঘুম ভাঙলো বেশ বেলা করে।

চোখ রগড়ে শয্যায় উঠে বসতেই মনে পড়লো তিলকবেশী দস্যু বনহুরের কথা, মনে পড়লো তার মূল্যবান হারছড়ার কথা। সত্যিই তিলক দস্যু কিনা পরীক্ষা করার জন্যই সে হারছড়া কাল রাতে দিয়ে এসেছিলো তিলকের কাছে। বিজয়ার সমস্ত মনপ্রাণ তিলককে সানন্দে গ্রহণ করেছে, অন্তর দিয়ে সে ভালবেসেছে ওকে। তার ভালবাসার কাছে ঐ মূল্যবান হারছড়ার মূল্য কিছু নয়। তাই বিজয়া নিজ কণ্ঠের হার দিয়ে তিলককে যাচাই করে দেখতে চায়। আরও সে যাচাই করে দেখতে চায়, তিলকের কাছে কোন্‌টার মূল্য বেশি—রাজকন্যা বিজয়া না মহামূল্য ঐ হারছড়া। তিলক যদি হারছড়ার মোহ ত্যাগ করতে না পারে, সে যদি ঐ হার নিয়ে নীল দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যায়, বিজয়ার দুঃখ নেই।

হঠাৎ বিজয়ার দৃষ্টি চলে গেলো সম্মুখস্থ আয়নায়, চমকে উঠলো সে নিজের গলায় তার মহামূল্য হারছড়া দেখতে পেয়ে। বিস্ময়ে যেন আরষ্ট হয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। ধীর পদক্ষেপে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, হারছড়ায় হাত বুলিয়ে অনুভব করলো সত্যিই তার গলায় সেই হারছড়া, যে হারছড়া সে কাল রাতে তিলকের কাছে জমা রেখে এসেছিলো।

বিজয়া অবাক না হয়ে পারলো না স্বয়ং দস্যু বনহুরের লোভহীন মনোভাব দেখে। আনন্দও হলো, কারণ দস্যু বনহুর এসেছিলো তার কক্ষে, নিজ হাতে সে হারছড়া পরিয়ে দিয়েছে তার গলায়। একটা অনাবিল খুশিতে মন ভরে উঠলো বিজয়ার।

ভোরে উঠার পর বিজয়া সখীদের নিয়ে রোজ দীঘিতে স্নান করতে যেতো। আজ আর সখীদের ডাকে সাড়া দিলো না, পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে অতি সন্তর্পণে। মনে তার রঙিন স্বপ্নের মায়াজাল। তিলক

দস্যু জেনেও বিজয়ার মনে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়নি, বরং একটা উজ্জ্বল দীপ্ত মনোভাব জেগেছে তার মনে—দস্যু হলেও তিলকের হৃদয় অনেক বড়, অনেক উচ্চ।

বিজয়া অতি লঘু পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো তিলকের কক্ষের দরজায়। দরজা ভেড়ানো—এখনও তবে নিদ্রাভঙ্গ হয়নি তিলকের। চুপি চুপি যাবে সে কক্ষমধ্যে, নিদ্রিত তিলককে সে চমকে দেবে এত ভোরে।

কক্ষের দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে বিজয়া। থমকে দাড়ালো সে, দু'চোখে ফুঠে উঠলো বিস্ময়—কই, তিলক তো নেই তার শয্যায়! কোথায় গেলো সে এত ভোরে। মুহূর্তে বিজয়ার আনন্দ যেন দপ্ করে নিভে গেলো প্রদীপের আলোর মত।

তিলকের শয্যা শূণ্য।

কক্ষমধ্যে সব কিছুই সাজানো রয়েছে থরে থরে। এমনকি তিলকের রাজকুমারের পোশাক পর্যন্ত আছে আলনায়। মহামূল্যবান কণ্ঠ হারছড়াগুলোও ঝুলছে একপাশে দেয়াল আলনায়। তিলক রাজকুমারের পোশাক যখন সজ্জিত হয়ে রাজদরবারে যেতো তখন এসব মূল্যবান হার তার কণ্ঠে শোভা বর্ধন করতো। মূল্যবান জুতো জোড়াও তেমনি পড়ে রয়েছে। সব রয়েছে—শুধু নেই তিলক।

বিজয়া চঞ্চলভাবে খুঁজলো তিলককে। কোথাও নেই সে। নাম ধরে ডাকলো—তিলক! তিলক! তিলক........

বিজয়া যখন ব্যস্তভাবে তিলকের সন্ধান করে চলেছে তখন তার পাশে এসে দাঁড়ালো বিজয়ার নতুন সহচরী নূপুর। বিজয়ার কাঁধে হাত রাখতেই চমকে ফিরে তাকালো বিজয়া।

নূপুর একটু হেসে বললো—প্রিয়া, যাকে খুঁজছো তাকে আর পাবে না।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো বিজয়া—নূপুর, তুই কি করে জানলি ওকে আর পাবো না?

জানি, সে নীল দ্বীপ ত্যাগ করে চলে গেছে।

তিলক নীলদ্বীপ ত্যাগ করে চলে গেছে!

হাঁ।

নূপুর, তুই কি করে জানলি এ কথা?

জানি।

বল্, বল্ কি করে তুই জানলি? বিজয় নূপুরের জামার অংশ চেপে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

নূপুর বলে—ছাড়ো সব বলছি।

তিলক আমাকে কিছু না জানিয়ে তোকে বলে চলে গেলো? না, আমি বিশ্বাস করি না তোর কথা।

স্থির হয়ে শোনো, সব বলবো তোমাকে।

বিজয়া নূপুরের মুখের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। নূপুর তার পুরান সহচরী নয়, কিছুদিন হলো তাকে সে সহচরী হিসাবে গ্রহণ করেছে। নূপুরকে তার বড় ভাল লেগেছিলো প্রথম থেকেই। যেমন নম্র তেমনি ভদ্র মেয়েটি। তাছাড়া বড় সুন্দর—অপূর্ব সুন্দরী, দেখলে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

বিজয়া তাই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলো ওকে। ওর ব্যবহার তাকে আরও বেশি মুগ্ধ করেছিলো। অল্পদিনেই বিজয়ার মনকে জয় করে নিয়েছিলো নূপুর। সহচরীদের মধ্যে তাই সবার চেয়ে প্রিয় ছিলো সে ওর কাছে। বিজয়া নূপুরের কথায় অবাক হয়ে বলে—তিলক, তোকে বলে গেছে নূপুর?

না।

তবে কি করে জানলি?

আমি সব জানি। রাজকুমারী, তিলকের সঙ্গে আমার অন্তরের গভীর আকর্ষণ আছে......

নূপুরের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বিজয়া—নুপুর; তুই জানিস তিলক আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন। ওকে আমি ভালবাসি......

বিজয়ার ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করে নূপুর মোটেই বিচলিত হয় না বরং তার মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে, বলে সে—বিজয়া, তোমার চেয়ে আমি অনেক গুণ বেশি ভালবেসেছি তাকে......

নূপুর! এত স্পর্ধা তোর!

স্পর্ধা নয় রাজকুমারী, এটা প্রত্যেক নারীর নিজস্ব সম্পদ। ভালবাসা কোনোদিন লোকসমাজ, জাতিভেদ বা সময়-কাল বিচার করে না। তুমিও যেমন নিজের অজ্ঞাতে তিলককে ভালবেসে ফেলেছো, আমার অবস্থাও তাই। জানি...একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে বলে আবার নূপুর—জানি, যাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি তাকে কোনোদিন পাবো না।

বিজয়ার ক্রুদ্ধ রাগত ভাব পূর্বের ন্যায় তীব্র রয়েছে, ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো সে—তবে অমন দুরাশা করেছিলি কেন?

যেমন তুমি।

তুই কি বলতে চাস তিলককে পাবার আশা আমার দুরাশা? তাকে ভালবেসে আমি......

হাঁ, তাকে ভালবেসে তুমি ভুল করেছো, কারণ তাকে পাবার আশা সম্পূর্ণ দুরাশা।

নূপুর!

সত্যি বলছি রাজকুমারী।

একটা ভীল যুবক, একটা নগণ্য দস্যুকে......

বিজয়া, তুমি জানো না, তাকে পাবার জন্য কত রাজকন্যা, কত বিদূষিণী, কত মহিষী, কত সুন্দরী নারী পাগলিনী কিন্তু কেউ তাকে পায়নি আজও......

বিজয়া বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে শুনে যাচ্ছে নূপুরের কথাগুলো। ওকে তো কোনোদিন এমন করে কথা বলতে শোনেনি সে। নূপুর তবে তিলক সম্বন্ধে জানে? তিলকের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক?

নূপুর বিজয়ার মনোভাব বুঝতে পারে, হেসে বলে—রাজকুমারী, তুমি ভাবছো আমার সঙ্গে কি তার সম্পর্ক! আমি কি করেই বা তার সম্বন্ধে এত জানলাম, তাই না?

হাঁ! তুই বল তিলকের সঙ্গে কি করে তোর পরিচয় হলো? আর কি করেই বা তোদের মধ্যে গড়ে উঠলো গভীর ভালবাসা?

এবার নূপুরের মুখমণ্ডল ম্লান হলো, একটা বেদনাভরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে, বললো—গভীরভাবে ভালবেসেছি তাকে কিন্তু তার কোনো প্রতিদান পাইনি। তার প্রতিদান কোনোদিন পাবো না, তাও জানি।

তাহলে......

তার সঙ্গে আমার পরিচয় আজও ঘটেনি তেমন করে। আমি শুধু তাকে ভালবেসেছি, সে আমাকে জানে না—কে আমি, কি আমার পরিচয়......

সেকি কথা?

হাঁ বিজয়া, অদ্ভুত আমার ভালবাসা। একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে নূপুর—জানি তাকে কোনোদিন পাবো না, তবু আমি ভালবেসে যাবো।

কি লাভ এতে হবে?

জানি না।

তিলক তোকে তাহলে দেখেনি কোনোদিন?

আমাকে সে দেখেছে কিন্তু জানে না কে আমি।

আশ্চর্য!

হাঁ, আশ্চর্যই বটে। কারণ সে আমাকে জানেনা চেনে না। আর আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। শুধু তাই নয় বিজয়া, আমি তাকে সর্বক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করি। যেখানে সে সেখানেই আমি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না রাজকুমারী।

নূপুর, তবে কি আমার ভালবাসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে?......বিজয়া নূপুরের হাত মুঠায় চেপে ধরে, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর।

বিজয়ার মুখোভাব লক্ষ্য করে নূপুরের বড় মায়া হলো, তার চোখ দুটোও অশ্রু ছলছল হলো, বললো সে—রাজকুমারী, ওকে যে নারী ভালবেসেছে, সেই ব্যর্থ হয়েছে— তুমিও ব্যর্থ হয়েছো বিজয়া।

না না, আমি ভাবতে পারছি না তিলক একেবারে চলে গেছে, এ কথা আমি ভাবতে পারছি না। ঐ তো ওর জামা-কাপড় সব সাজানো রয়েছে। ঐ তো পায়ের জুতো তাও রয়েছে......

তার নিজস্ব পরিচ্ছদ পরেই সে চলে গেছে। রাজকীয় পোশাক তার প্রয়োজন নেই। বিজয়া, এবার আমিও বিদায় চাই।

নূপুর!

হাঁ রাজকুমারী, আর আমি নীল দ্বীপে থাকতে চাই না। কাজ আমার শেষ হয়েছে।

সেকি, চলে যাবি নূপুর?

হাঁ।

নূপুর!

আমি নূপুর নই......

তবে তুমি—তুমিই কি আশা?

হাঁ, আমার একনাম আশা।

তুমিই আশা? তুমিই তবে তীর নিক্ষেপ করতে?

হাঁ, আমিই সেই আশা। আচ্ছা, এবার আমি চলি রাজকুমারী বিজয়া?

নূপুর, আমার কাছেও তুমি আত্মগোপন করে চলে যাবে? পরিচয় দেবে না আমাকে?

তুমি আমাকে তোমার সহচরী নূপুর বলেই জানবে। আচ্ছা, আসি রাজকুমারী। নূপুরবেশিনী আশা বেরিয়ে যায়।

বিজয়া পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

❑

বনহুর আস্তানায় ফিরে এলো।

বনহুরের অনুচরগণ তাকে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু সবার মুখমণ্ডল বিষণ্ন ম্লান দেখতে পেয়ে বনহুর একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে উঠলো। আস্তানার মধ্যে এগুতে এগুতে বললো—রহমান, আস্তানার সব কুশল তো?

রহমান কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নত করে নিলো।

কায়েসও এগুচ্ছিলো তাদের সঙ্গে, বললো সে—সর্দার, কাউকে কিছু না বলে নূরী কোথায় চলে গেছে......

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর, দু'চোখ স্থির করে তাকালো সে কায়েসের মুখে—নূরী আস্তানায় নেই?

না।

বনহুর এবার তাকালো রহমানের দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—রহমান?

বলুন সর্দার?

নূরী কোথায় গেছে? কেন গেছে সে?

যতদূর মনে হয়, নূরী আপনার সন্ধানে চলে গেছে। এক দিন গভীর রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে জাভেদকে নাসরিনের শয্যায় শুইয়ে রেখে কোথায় অন্তর্ধান হয়েছে, কেউ জানে না।

বনহুরের মুখোভাব ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠলো; একটি কথাও সে উচ্চারণ করলো না। নিজ বিশ্রামকক্ষের দিকে এগিয়ে চললো।

একটু পরে নাসরিন জাভেদকে কোলে করে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

বনহুর পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো, জাভেদের মুখে দৃষ্টি পড়তেই তার মুখোভাব করুণ হয়ে উঠলো।

জাভেদ তখন ফিক্ ফিক্ করে হাসতে শুরু করেছে। হাত-পা-নাড়ছে সে আর অস্ফুট শব্দ করছে......আ-ব্বা-ব্বা-ব্বা......

বনহুর এগিয়ে এলো নাসরিনের পাশে। হাত বাড়াতেই জাভেদ ঝাঁপিয়ে পড়লো পিতার কোলে।

বনহুর জাভেদকে বুকে চেপে ধরলো, অতি কষ্টে নিজের অশ্রুবেগ সংরক্ষণ করে পুনরায় জাভেদকে ফিরিয়ে দিলো নাসরিনের কোলে।

নাসরিন যেমন নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছিলো, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর শয্যায় অর্ধ শায়িত অবস্থায় বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে লাগলো।

আস্তানায় বনহুর যখন নূরীর কথা ভাবছে তখন নূরী নীল দ্বীপে ক্যাপ্টেন রণজিৎ লালের কাছে বন্দিনী অবস্থায় রয়েছে। তাকে পাগলিনী মনে করে আটক রেখেছে সে।

নূরীর সুন্দর চেহারা রণজিৎকে মুগ্ধও করেছে, তাই সে ওকে আটক রেখে চিকিৎসা চালানোর ব্যবস্থা করলো।

নূরী অবশ্য পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ হয়নি, সে রীতিমত সুস্থ আছে। ক্যাপ্টেন রণজিতের কুৎসিত মনোভাব বুঝতে পেরে পাগলিনীর অভিনয় করে চলেছে।

সেদিন জাহাজে সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় যখন গোগ্রাসে খাচ্ছিলো তখন তাকে খালাসীরা ধরে ফেলে এবং নিয়ে যায় তাদের ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন নূরীকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো, নূরীর সৌন্দর্য তাকে অভিভূত করে ফেলেছিলো একেবারে। প্রথমে ক্যাপ্টেন রণজিৎ নূরীকে করুণার দৃষ্টিতে দেখলেও পরে তার প্রতি কেমন যেন একটা লোলুপ ভাব নিয়ে তাকাচ্ছিলো, নূরী ভাবলো, এই লোকটার হাত থেকে তাকে বাঁচতে হবে এবং কৌশলে নীল দ্বীপেও পৌঁছতে হবে।

ক্যাপ্টেন রণজিৎ একসময় নূরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলো—এই, তোমার নাম কি?

নূরী রণজিতের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে পেট দেখালো, আর মুখে হাত গুঁজে কিছু খেতে চাইলো।

রণজিৎ সঙ্গে সঙ্গে খাবার এনে দিলো, প্রচুর খাবার।

নূরী পেট পুরে খেলো, কতক সে ছড়ালো চারপাশে। কখনও খিল খিল করে হাসলো, কখনও কাঁদলো সে সত্যি সত্যি জাভেদের কথা মনে করে।

রণজিৎ মনে করলো মেয়েটা বদ্ধ পাগল।

নিয়ে এলো সে ওকে নীলদ্বীপে।

নূরীর মনে একটা আশার আলো উঁকি দিয়ে গেলো—নীলদ্বীপে সে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে—এবার সে যেমন করে হোক তার হুরকে খুঁজে বের করবেই।

কিন্তু নূরীর আশা সফল হলো না, তাকে আটক করে রাখলো রণজিৎ অতি সাবধানে। সে মনে করলো, মেয়েটি পাগল—কাজেই সে কোথাও চলে যেতে পারে। সাবধানে রেখে তার চিকিৎসা চালালে মন্দ হয় না। এমন সুন্দরী তরুণী সে কোনোদিন দেখেছে কিনা সন্দেহ।

রণজিৎ সব সময় নূরীর দিকে খেয়াল রাখলো। ওকে আকৃষ্ট করার জন্য সে নানারকম উপায় অবলম্বন করতেও ছাড়লো না।

নূরী এতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলো কারণ তার প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিলো।

ক্যাপ্টেন রণজিৎ শত শত টাকা ব্যয় করে চললো নূরীর জন্য। নীল দ্বীপের ডাক্তার সবাই নূরীকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

নূরী বিপদে পড়লো, তাকে নিয়ে রণজিতের মাথাব্যথার কারণ সে জানে; তাই সে পাগলিনীর অভিনয় করে চলেছে। ডাক্তারগণ তাকে পরীক্ষা করে কোনো রোগ খুঁজে পেলো না।

একদিন রণজিৎ নূরীর কক্ষে প্রবেশ করে ওকে ধরে ফেললো—এই, তোকে আমি খুব ভালবাসি!

নূরী তখন বিশ্রাম করছিলো, কক্ষমধ্যে অন্য কোনো জনপ্রাণী নেই। রণজিৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসেছে। শিউরে উঠলো নূরী। আজ এর কবল থেকে তার রক্ষার কোনো উপায় নেই। এতোদিন নানা ছলনায়, নানা কৌশলে নিজকে সে ঐ কামাতুর ক্যাপ্টেনটার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে, আজ বুঝি আর হলো না।

নূরী ক্যাপ্টেন রণজিতের বাহু দুটোকে এক ঝটকায় মুক্ত করে নিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর বললো—আমাকে ভালবাসিস!

হাঁ, খুব ভালবাসি রাণী।

ক্যাপ্টেন রণজিৎ নূরীর নাম খুঁজে না পেয়ে তাকে রাণী বলে ডাকতো। রাণী বলে ডাকলে নূরীও জবাব দিতো ঠিকমত।

রণজিৎ নেশাভরা চোখে তাকিয়ে আছে নূরীর যৌবনভরা দেহের দিকে। নূরী নিজকে ওর দৃষ্টির আড়ালে নেবার জন্য খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নূরী হঠাৎ হাসতে শুরু করলো ভীষণভাবে, সে হাসি যেন থামতে চায় না। তারপর বললো—আমাকে তুই খুব ভালবাসিস, তাই না?

হাঁ, হাঁ রাণী। আমি তোকে অনেক গহনা দেবো, অনেক শাড়ি-জামা দেবো, অনেক টাকা দেবো......

আর কি দিবি?

যা নিবি তাই দেবো। কথার ফাঁকে রণজিৎ নূরীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

নূরীর বুকটা অজানিত একটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সে চারিদিকে। বন্ধ কক্ষে শুধু সে, সে আর ক্যাপ্টেন রণজিৎ।

নূরী ভাবছে এবার আর সে নিজকে বাঁচাতে পারলো না। সে মনেপ্রাণে খোদাকে স্মরণ করে চলেছে। হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে গেলো ওপাশে একটা ত্রিপয়ার উপর। সেখানে কিছু পূর্বে তাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিলো, থালা এবং গেলাসটা তখনও পড়ে রয়েছে।

নূরী এগিয়ে গেলো, দ্রুত হস্তে তুলে নিলো গেলাসটা।

রণজিৎ তখন নেশাগ্রস্ত মাতালের মত নূরীর দিকে এগিয়ে আসছে। দু'চোখে লালসাপূর্ণ ভাব। দু'হাত প্রসারিত করে দিয়েছে সে সামনের দিকে। এবার সে ধরে ফেলবে নূরীকে।

নূরী এবার হাতের গেলাসটা ছুড়ে মারলো প্রচণ্ডভাবে।

রণজিৎ ভাবতে পারেনি পাগলিনী রাণী তাকে এভাবে মারতে পারে। গেলাসটা রণজিতের কপালে লেগে ছিটকে পড়লো ওপাশে। সঙ্গে সঙ্গে দর দর করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো।

রণজিৎ এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, সে হাতের পিঠে রক্ত মুছে নিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—রাণী তুই পাগল! আমরা তোকে পাগল মনে করি! হাঃ, হাঃ, হাঃ, এবার বুঝেছি সব তোর নেকামি। পাগল হলে তার এত জ্ঞান থাকে........কথার ফাঁকে রণজিৎ ধরে ফেলে নূরীকে।

নূরী এবার মরিয়া হয়ে উঠে। ভীষণভাবে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করে মুখোশ পরা এক নারী, তার দক্ষিণ হস্তে রিভলভার। কঠিন কণ্ঠে বলে—ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।

হঠাৎ এক নারীর আবির্ভাব ক্যাপ্টেন রণজিৎ ঘাবড়ে গেলো ভীষণভাবে—কে এই নারী? বিশেষ করে তার হস্তের রিভলভার তাকে ভীত করে তুললো। মুক্ত করে দিলো সে নূরীকে।

নূরী ছাড়া পেয়ে ছুটে এলো সেই নারীর পাশে। চোখেমুখে তার ভয়-ভীতি আর কৃতজ্ঞতা।

নারীটি বললো—এসো তুমি আমার সঙ্গে।

নূরী যেন এতক্ষণে বুকে সাহস পেলো, অনুসরণ করলো। সে নারীটিকে।

নারীটি রিভলভার ক্যাপ্টেন রণজিতের বুকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে পিছু হটে বেরিয়ে এলো বাইরে।

বাইরেই অপেক্ষা করছিলো একটি ঘোড়া, নারীটি নূরীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে নিজেও চেপে বসলো।

উল্কা বেগে ছুটতে লাগলো অশ্বটি।

নূরীর অভ্যাস আছে অশ্বপৃষ্ঠে চাপা, তাই তার কোনো অসুবিধা হলো না।

ক্যাপ্টেন রণজিতের লোক পিছু ধাওয়া করেও আর পেলো না তাদের।

নূরীসহ নারীটি তার অশ্ব নিয়ে এক পোড়োবাড়ির সম্মুখে এসে থামলো।

নেমে পড়লো নারীটি, নূরীও নামলো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে।

নারীটি বললো—এসো, আর তোমার ভয় নেই।

নূরীর চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

নারীটি নূরীসহ এসে দাঁড়ালো পোড়াবাড়ির অভ্যন্তরে।

নূরী বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। সেখানে কোনো জনমানব বাস করে বলে মনে হয় না। নির্জন ভাঙ্গাচুরো বাড়ি। কোনো আসবাবও নেই সেখানে, শুধু আগাছা আর জঙ্গল। কতকগুলো বাদুড় এদিক ওদিক উড়তে শুরু করেছে।

নারীটি তার মুখের মুখোশটি খুলে ফেললো। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে একটা তাকের উপর রাখলো, তারপর বললো—এবার বলো কে তুমি? আর যে তোমাকে আক্রমণ করেছিলো সেই বা কে?

নূরী তখনো নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো নারীটির দিকে।

নারীটি হেসে বললো—আমাকে তোমার কোনো ভয় নেই, কারণ আমিও নারী। বলো বোন, তোমার কাহিনী আমাকে বলো, আমি তোমাকে যতদূর পারি সাহায্য করবো।

নূরী একে কোনোদিন দেখেনি, কোনোদিন পরিচয়ও ছিলো না ওর সঙ্গে। ওর কথাগুলো বড় মিষ্টি লাগে তার কানে। নূরী অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেয়েছে, একটা নিরাপদ স্থান যেন পেয়েছে সে। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানায় নূরী মনে মনে।

নারীটি বলে আবার—কি ভাবছো?

না, কিছু ভাবছি না। ভাবছি আপনি যদি ঠিক সময় আমাকে ওর কবল থেকে উদ্ধার না করে নিতেন তাহলে কি যে হতো! সত্যি, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

নারীটি হেসে বললো—কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন নেই বোন, তুমি তোমার কাহিনী বলো?

নূরী পারলো না ওর কাছে নিজের পরিচয় গোপন করতে, বলতে শুরু করলো সে—আমি বোন একজনের সন্ধানে এই নীল দ্বীপে এসেছি। জানি না সে কোথায়—তাকে খুঁজে পাবো কিনা, তাও জানি না।

তুমি আমার কাছে সব খুলে বলো, যদি সম্ভব হয় তোমাকে সহায়তা করবো এবং তোমার সাথীকে খুঁজে বের করে দেবো......

পারবেন আপনি আমার সাথীকে খুঁজে বের করতে? পারবেন আপনি?

নিশ্চয়ই পারবো।

নূরী সব খুলে বললো, তবে তার স্বামীর নাম সে গোপন করে গেলো।

সুচতুরা নারীর মন মুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে উঠলো, একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে, সে বললো,—বোন, তুমি যাকে খুঁজছো সে ফিরে গেছে তার আবাসে। তুমি ভুল করেছো তার খোঁজে এসে।

আপনি তাকে চেনেন? দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বলে নূরী।

নারীটি স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলে—বোন, আমিও যে তাকেই খুঁজে ফিরছি।

আপনি......আপনি তাকে......

হাঁ বোন, আমিও তাকে......

তুমি......তুমি কে, কে তুমি? নূরীর চোখ দুটোতে এক রাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে। ওর পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে দেখে সে স্থির দৃষ্টি মেলে।

নারীটি বুঝতে পারে নূরী মনে মনে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মৃদু হেসে সে ওর দিকে তাকিয়ে।

নূরী বলে উঠে—আমার স্বামীকে তুমি কি করে চিনলে? আর তাকে তুমি কেনই বা খুঁজে চলেছো? বলো জবাব দাও?

নারীটি এবার হেসে উঠে খিল খিল করে, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—কারণ আমি তাকে ভালবাসি।

বিদ্যুৎ গতিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায় নূরী, ভ্রুকুঞ্চিত করে বলে উঠে—কোন্ অধিকারে তুমি তাকে ভালবাসো?

নারীটি তেমনি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে—জানি তাকে ভালবাসার কোনো অধিকার আমার নেই, তবু ভালবাসি। যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন......

চুপ করো। কে তুমি বলো?

আমি কে জানতে চাও?

হাঁ।

পরিচয় দেবার মতো আমার কিছু নেই। শুধু জেনে রাখো, আমি তোমার স্বামীর মঙ্গলকামী এক নারী।

নূরীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়......কে এই নারী, কিই বা এর পরিচয়? আর সে তার স্বামীকে চেনে। শুধু চেনেই না, তাকে সে রীতিমত ভালও বাসে। তবে নিশ্চয়ই এ নারী তার স্বামীর আসল পরিচয়ও জানে। নূরীর চোখমুখে একটা ভীত ভাব প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে নম্র হয়ে আসে তার মুখমণ্ডল।

নারীটি বুঝতে পারে নূরীর মনোভাব, মৃদু মৃদু হাসে সে—তারপর বলে—বোন, আমি সব জানি।

আমার স্বামীর পরিচয় তুমি জানো?

হাঁ।

কে, কে তুমি?

বলেছি আমার পরিচয়ে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার স্বামীও আমাকে চেনে না, জানে না আমার পরিচয়।

তবে কি করে তুমি তাকে......

হাঁ, তবু আমি তাকে ভালবাসি। তাকে ভালবেসেই যাবো আমি চিরকাল, প্রতিদান আমি চাই না।

কি লাভ তাতে তোমার?

একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠে নারীটির ঠোঁটের কোণে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—লাভ জানি না। তবে আমার মন যা চায় আমি তাই করি। আমি চাই তার মঙ্গল।

নূরী পূর্বের চেয়ে অনেকটা স্বাভাবিক এবং শান্ত হয়ে এসেছে। বললো নূরী—আমাকে তুমি মাফ করে দাও বোন।

নারীটি বললো—তোমার তো কোনো দোষ নেই। যে কোনো নারীই চায় তার স্বামী তারই ভালবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমার কথায় তুমি রাগান্বিত হয়েছিলে. এ তোমার দোষ নয় বরং আমিই অপরাধী তোমাদের কাছে।

এবার নূরী বললো—পরিচয় দেবে না জানি কিন্তু একটা কথা আমাকে বলবে ঠিক করে?

বলবো, বলো?

ঐ শয়তান ক্যাপ্টেনটার কবল থেকে আমাকে ঠিক সময় কিভাবে তুমি......

মানে কিভাবে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়েছি, এইতো?

হাঁ।

তবে শোনো, আমি আজই নীল দ্বীপ ত্যাগ করার বাসনায় নীল দ্বীপ বন্দরে যাই। সেখানে গিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎ আশায় তার অফিসরুমে যাই। সেখানে তাকে না পেয়ে বিশ্রাম ক্যাবিনের দিকে অগ্রসর হই। এবার বুঝতেই পারছো আমার আগমন অবস্থার কথা, তারপর সবতো তুমি অবগত রয়েছো। আমি জানতাম না কে তুমি, তোমার কথায় সব জানতে পেরেছি। আজ আমি পরম আনন্দিত তোমাকে সেই দুশ্চরিত্র ক্যাপ্টেনের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরেছি বলে।

নূরীর মন সচ্ছ হয়ে আসে, দীপ্ত হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল।

নারীটি বলে—আমাকে আজই যেতে হবে। বোন, তুমি এখানে অপেক্ষা করবে, তোমার জন্য আমি খুঁজে আনবো তাকে। হাঁ, ঐ পাশের কামরায় সব আছে—খাবে, শোবে, বিশ্রাম করবে।

আমি একা এই নির্জন পোড়োবাড়িতে......

কোনো ভয় নেই, এখানে কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। যাও বোন, পাশের কক্ষে যাও।

❑

হঠাৎ সেদিন মনসুর ডাকুর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তার লৌহ প্রাচীরে ঘেরা শয়নকক্ষে শিয়রে দাঁড়ানো এক নারীমূর্তিকে দেখতে পেলো সে, আরও দেখলো তার দু'হস্তে দুটি রিভলভার।

মনসুর ডাকু চমকে উঠলো ভীষণভাবে, গর্জন করে বললো—কে, কে তুমি?

আমি আশা!

আশা! অস্ফুট শব্দ করে উঠে মনসুর ডাকু।

হাঁ। মনসুর, আজ তুমি যে গোপন বৈঠক করেছো সব আমি শুনেছি।

এ্যা, আমার গোপন বৈঠকের সব আলোচনা তুমি শুনেছো?

হাঁ, মনে রেখো তোমার ভবিষ্যৎ তুমিই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছো। যে দস্যু বনহুর তোমাকে বারবার হত্যা করতে গিয়েও হত্যা করেনি, তোমাকে সে ক্ষমা করেছে, আর তুমি তাকে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছো? তোমার কন্যা ইরানীর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছো! তোমার বেঈমানী আর তোমার কন্যার শয়তানি আমি খতম করে দেবো জন্মের মত।

মনসুর ডাকু ভীত নজরে তাকাচ্ছে আশার হাতের উদ্যত রিভলভারের দিকে আর এক একবার তাকাচ্ছে তার মুখোশপরা মুখখানায়।

খিল খিল করে হেসে উঠে আশা, দক্ষিণ হস্তের রিভলভারখানা মনসুর ডাকুর বুকে চেপে ধরে বলে—দস্যু বনহুর তোমাকে ক্ষমা করলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। কাল ভোরে তোমার অনুচরগণ তোমার লাশ দেখতে পাবে এই কক্ষে।

এবার মনসুর ডাকুর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

আশা বললো—কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। চেপে ধরলো সে রিভলভারখানা আরও শক্ত করে।

মনসুর ডাকু দেখলো আজ তাকে মরতেই হবে। দস্যু বনহুর হস্তে মৃত্যু হলে তবু তার এত দুঃখ ছিলো না। আজ তাকে তার নিজ শয়নকক্ষে একটা নারীহস্তে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এমন লজ্জা, এমন অপমান তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নেবে। স্তব্ধ হয়ে কিছু ভাবছে মনসুর ডাকু, তার চোখের সম্মুখে ভাসছে কাল ভোরের দৃশ্যটা। কিভাবে তার লাশ এই কক্ষে পড়ে থাকবে, কিভাবে তার অনুচরগণ এসে তার লাশ দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবে, কিভাবে তারা ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়বে......সব যেন ছায়াছবির মত উদয় হয় তার মনের আকাশে। বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে বলে মনসুর ডাকু—আশা, জানি না তুমি কে! আমি তোমার কাছে খোদার নামে শপথ করছি, আর আমি দস্যু বনহুরের হত্যা নিয়ে ষড়যন্ত্র চালাবো না।

তোমার শপথ আমি বিশ্বাস করি না। তোমার জীবন বাঁচাতে পারো এক শর্তে—তুমি এই মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে তোমার আস্তানা ত্যাগ করে চলে যাও। এতোকাল যা সঞ্চয় করেছো তার এক কণা তুমি গ্রহণ করতে পারবে না।

আমি—আমি কোথায় যাবো?

জীবন চাও না অর্থ-ঐশ্বর্য চাও?

জীবন......ঢোক গিলে বললো মনসুর ডাকু।

বেশ, তাই হলো। তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিলাম।

কেথায় যাবো?

বনে।

বনে?

হাঁ।

কি করবো?

তোমার মন তোমাকে পথ বলে দেবে। যাও, বেরিয়ে যাও আস্তানা থেকে। আর কোনোদিন এখানে ফিরে এসো না।

আমার মেয়ে ইরানী......

তার জন্য তোমার ভাবতে হবে না।

কিন্তু........

কোনো কিন্তু নয়। ইরানী শিশু বা বালিকা নয়—সে সব বুঝতে শিখেছে, কাজেই তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না মনসুর, যাও।

মনসুর ডাকু রাতের অন্ধকারে মন্থর গতিতে তার আস্তানা ত্যাগ করে চলে গেলো।

সেদিনের পর থেকে মনসুর ডাকুর মধ্যে এলো বিরাট এক পরিবর্তন। যে ডাকু ছিলো ভয়ঙ্কর এক পৈশাচিক নরশয়তান, সেই হলো এক মহৎ দরবেশ।

বন জঙ্গল হলো তার আবাসভূমি।

মুখে দাড়ি-গোফ ছেয়ে গেলো। মাথায় চুল লম্বা হয়ে কাঁধের উপর ঝুলে পড়লো। গায়ে ছেঁড়া জামা, পরনে ছেঁড়া পায়জামা, একটা মোটা কম্বল কাঁধে নিয়ে সব সময় সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষুধা হলে গাছের ফল খায়, পিপসা পেলে নদী বা ঝরণার পানি পান করে। রাত হলে কম্বল গায়ে জড়িয়ে গাছ তলায় শয়ন করে।

অদ্ভুত এক শক্তি লাভ করলো মনসুর ডাকু; তাকে কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে না, তাকে দেখলে বন্যপশু ধীরে ধীরে সরে যায়।

মনসুর ডাকু রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে গেলো তার অনুচরগণ কেউ আর তাকে খুঁজে পেলো না। সবাই সন্ধান করে ফিরতে লাগলো এখানে সেখানে শহরে বন্দরে।

ইরানীতো কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে পড়লো : এ পৃথিবীতে তার একমাত্র পিতা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। ইরানী নিজে পিতার সন্ধানে ব্যাকুলভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অনুচরদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলো, তার পিতাকে যে খুঁজে আনতে পারবে তাকে সে বহু অর্থ পুরস্কার দেবে।

গত রাতে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিলো তাদের মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেলো। ইরানী বললো—আমার বাবা যখন নিরুদ্দেশ তখন আস্তানার সব কাজ বন্ধ থাকবে।

সর্দার-কন্যা ইরানীর আদেশ অমান্য করার সাহস কারো ছিলো না, সবাই মিলে তারা দস্যুতা ত্যাগ করে সর্দারের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

❑

কান্দাই শহরে এমন শান্তিভাব কোনোদিন আসেনি বনহুরের হত্যালীলার পর অসৎ ব্যবসায়ীদল একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিলো। যেন কেউ কোনো রকম কুকর্ম আর মন্দ কাজ করতে সাহসী হয়নি।

পুলিশ মহল অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েও আর তেমন কোনো রা. াজানি, দস্যুতা বা হত্যাকান্ডের খোঁজ পায়নি। তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প ড়ছে।

মার্কিন ডিটেকটিভ মিঃ লাউলং এসেছিলেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে কৃতিত্ব অর্জন করতে কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কান্দাই আসার

পর তিনি নানাভাবে এই বিখ্যাত দস্যুকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাসনা সফল হয়নি বরং দস্যু বনহুরের কাছেই তিনি নাকানি-চুবানি খেয়েছেন। পুলিশ সুপার মিঃ আরিফের অবস্থাও তাই, তিনিও আপ্রাণ চেষ্টায় দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে আগ্রাহান্বিত হয়েও কৃতকার্য হতে পারলেন না। রাগে-ক্ষোভে তিনি ভিতরে ভিতরে ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষ করে দস্যু বনহুর তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলো—এতো দুঃসাহসী দস্যুকে তিনি শায়েস্তা করতে না পারায় তাঁর আফসোসের সীমা ছিলো না।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ ইয়াসিন সরকারি চাকুরে হলে কি হবে কোনোদিনই দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উৎসাহী ছিলেন না। তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন দস্যু বনহুর কোনোদিন মানুষের অমঙ্গলকামী ব্যক্তি নয়। সে যত দস্যুতাই করুক বা যত হত্যাই করুক, এ সবের পিছনে রয়েছে মানুষেরই কল্যাণ। তাই মিঃ ইয়াসিন দস্যু বনহুর সম্বন্ধে একটা সুন্দর মনোভাব পোষণ করতেন।

মিঃ কাওসারী, মিঃ হাসান এঁরা বনহুরের কাছে রীতিমত অপদস্থ হয়েছিলেন, তাই তাঁরা আজও বনহুর গ্রেপ্তারে সর্বক্ষণ উন্মুখ রয়েছেন। এখনও তাঁরা পূর্বের মত শহরের বিভিন্ন স্থানে সন্ধানকার্যে লিপ্ত আছেন। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তাঁরা শুধু সুনামই অর্জন করবেন না, মোটা পুরস্কার লাভে সক্ষম হবেন।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের পাহারাদারগণ ছদ্মবেশে পাহারার কাজ চালিয়ে চলেছে।

যত অসৎ ব্যবসায়ী এবং ঘুষখোর ব্যক্তিই হোক তবু তাদেরকে হত্যা করা অপরাধ—সেই অপরাধেই অপরাধী দস্যু বনহুর আর সেই কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য।

পুলিশ বাহিনী যত ব্যস্ত-তটস্থ হয়ে দস্যু বনহুরকে সন্ধান করে চলুক না কেন, তাকে পাওয়া সাধ্য কি তাদের। দস্যু বনহুর তখন নীল দ্বীপে কাপালিক হত্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

অনেক দিন পর বনহুর কান্দাই ফিরে এসেছে, অনেক কিছু খোঁজ-খবর নেওয়া তার দরকার।

প্রথম দিনই নূরীর কথা শুনে মনটা তার বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে সে কোথায় চলে গেছে কে জানে!

বনহুর দরবারকক্ষে তার আসনে উপবেশন করে রহমান ও অন্যান্যের কাছে জেনে নিলো কান্দাইর সমস্ত খবর। এখন দেশে কোনো অন্যায়-অনাচার চলছে কিনা......পুলিশ মহল কিভাবে কাজ করে চলেছে...মনিরা

ও নূরের সংবাদ কি......সব শুনে নিলো বনহুর। এমন কি মাহমুদার স্বামী পুলিশ সুপার মিঃ আমিনুর খানের বিষয়েও অবগত হলো।

আমিনুর খান বনহুর গ্রেপ্তারের জন্য এখনও উন্মুখ, সে কথাও জানতে পারলো বনহুর তার অনুচরগণের মুখে। বিশেষ করে ইশরাৎ জাহানের বড় ভাই আহসানও যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে।

কথাটা শুনে বনহুরের মুখে একটা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি ফুটে উঠলো। বললো বনহুর—রহমান, তুমি আজই আহসান ও লাহারার পুলিশ সুপার আমিনুর খানকে আমার শহরে আস্তানায় হাজির করবে।

সর্দার, আপনার নির্দেশমত কাজ হবে।

যাও, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে শহরের আস্তানা অভিমুখে রওয়ানা হবো।

দরবার শেষ হলো।

বনহুর ফিরে এলো নিজের বিশ্রামকক্ষে।

গভীর মনোযোগ সহকারে পায়চারী করে চললো সে। কি যেন ভাবতে লাগলো আপন মনে। একসময় তার কানে ভেসে এলো জাভেদের কান্নার শব্দ।

বনহুরের চিন্তা জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, পায়চারী বন্ধ করে সে কান পেতে শুনতে লাগলো। জাভেদের কান্নার আওয়াজ তার কাছে বড় অসহায় করুণ মন হলো। ধীর পদক্ষেপে বনহুর এগিয়ে চললো যেদিক থেকে কান্নার শব্দটা ভেসে আসছিলো।

কখন সে নিজের অজ্ঞাতে নাসরিনের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

নাসরিন কিছুতেই জাভেদকে চুপ করাতে পারছিলো না। অবিরত সে একটানা কেঁদে চলেছে। নাসরিন চেষ্টা করছে তাকে শান্ত করার জন্য।

বনহুর দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে জাভেদের দিকে।

হঠাৎ নাসরিনের দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের দিকে। বলে উঠে নাসরিন—সর্দার, একে কিছুতেই রাখতে পারছি না।

বনহুর এগিয়ে এলো, হাত বাড়ালো জাভেদের দিকে।

জাভেদ ঝাঁপিয়ে পড়লো পিতার কোলে।

বনহুর বুকে চেপে ধরলো জাভেদকে।

আশ্চর্য, বনহুরের কোলে জাভেদ চুপ হয়ে গেলো, সে যেন তার আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছে। ওর পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো বনহুর—নাসরিন, জানি না নূরী কোথায় গেছে, কেমন আছে তাও জানি না......কণ্ঠ ধরে আসে তার।

নাসরিন কোনো জবাব দেয় না, সে মাথা নিচু করে থাকে। তার মুখমণ্ডল করুণ বিষণ্ন। নূরীর জন্য তারই কি কম ব্যথা! হাজার হলেও

একসঙ্গে ওরা দু'জন ছোট থেকে বড় হয়েছে। একসঙ্গে খেলা করেছে, একসঙ্গে বনে বনে ঘুরে ফিরেছে। আজ যেন সে সাথীহারা হয়ে পড়েছে। নাসরিন তাকালো সর্দারের গম্ভীর বিষণ্ন মুখের দিকে, বললো—সর্দার, নূরী নিশ্চয়ই নীল দ্বীপে গেছে।

বনহুর বললো—হয়তো হবে। আমি সেখানে যাবো কিন্তু সে যদি সেখানে ঠিকমত পৌঁছে থাকে তবেই পাবো।

সর্দার, আপনি আর বিলম্ব করবেন না।

হাঁ, যত শীঘ্র পারি যাবো। বনহুর জাভেদকে এবার নাসরিনের কোলে ফিরিয়ে দেয়। জাভেদ ততোক্ষণে পিতার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

বেরিয়ে যায় বনহুর।

❑

মিঃ আমিনুর খান ও মিঃ আহসানকে বনহুরের সম্মুখে এনে দাঁড় করানো হলো। দু'জনার চোখেই পট্টি বাঁধা। বনহুরের ইঙ্গিতে বন্দীদ্বয়ের চোখের পট্টি খুলে দেওয়া হলো।

চোখ দুটো মুক্ত হওয়ায় আমিনুর খান ও আহসান সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বিস্ময়ে চমকে উঠলো। বনহুরের মাথার পাগড়ীর কিছু অংশ দিয়ে মুখের নিচের দিকটা ঢাকা ছিলো। তার দু'পাশে দন্ডায়মান রহমান ও কায়েস।

বনহুরের হাতে রিভলভার, একখানা পা তার আসনে রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো। দক্ষিণ হস্তের রিভলভারখানা দোলাচ্ছিলো সে মাঝে মাঝে।

আমিনুর খান ও আহসান ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলো বনহুরের মুখের দিকে। হয়তো বা তখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি কোথায় তাদেরকে আনা হয়েছে, আর যে সম্মুখে দন্ডায়মান সেই বা কে।

বনহুর মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে আমিনুর খান আর আহসানের চোখ কপালে উঠলো। ঢোক গিললো তারা, কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো না।

বনহুর বললো—চিনতে পেরেছো, আমিই আপনাদের সেই নগণ্য ব্যক্তি। যাকে আপনারা অহরহঃ সন্ধান করে ফিরছেন সেই দস্যু বনহুর আপনাদের সম্মুখে দন্ডায়মান। কই, গ্রেফতার করুন?

আমিনুর খান এবং আহসানের মুখে একটা হতভম্ব ভাব ফুটে উঠেছে। দু'চোখে বিস্ময়, ভয়-ভীতি আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাব। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে তারা বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—টাকার লোভে না কৃতিত্বের লোভে আপনারা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে চান? বলুন, জবাব দিন?

আমিনুর খান এবার কথা বললো—অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

বনহুর এবার হেসে উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ, বড় সুন্দর উদ্দেশ্য! বেশ, তাই হবে, কিন্তু তার পূর্বে বিচার করতে হবে অপরাধী কি রকম শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। বসুন পুলিশ সুপার মিঃ আমিনুর খান, ঐ চেয়ারে বসুন।

আমিনুর খান মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

আহসান তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে চোখেমুখে অপদস্থ ভাব।

বললো বনহুর—বসুন বিচার করুন। আচ্ছা না বসালেন, দাঁড়িয়ে সব শুনুন। যারা দেশের শত্রু, জনগণের শত্রু, আমি তাদেরকেই শাস্তি দিয়ে থাকি। যে ব্যক্তিগণ দেশের জনগণের সর্বনাশ করে থাকে আমি তাদের সর্বনাশ করি। যারা নিজের স্বার্থে আত্মহারা হয়ে পরের অমঙ্গল করে আমি তাদের অমঙ্গল করি। যারা পরের রক্ত শুষে নিয়ে নিজেদের হাত তাজা করে, আমি তাদেরই রক্ত শুষে নেই। হাঁ, এসব আমার কাজ আর এই কাজগুলোকে আপনারা যদি অপরাধ বলে মনে করেন তবে নিন, এই মুহূর্তে আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে চলুন। বনহুর ওপাশ থেকে একটা হাতকড়া তুলে নিয়ে হাত দু'খানা এগিয়ে ধরলো মিঃ আমিনুর খানের সম্মুখে।

আমিনুর খান কি যেন ভাবছিলো, হঠাৎ সে বনহুরের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—আমি......আমিই অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করো ভাই! আমাকে ক্ষমা করো......

আহসানও হাতজুড়ে বলে উঠলো—আমিও দোষী! আপনার অন্তরের আসল রূপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, তাই আমরা ভাল নজরে দেখিনি আপনাকে। আজ আমাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। আপনি শুধু মহৎজন নন, আপনি মহান।

বনহুর হাসলো—দেখুন, আমি মহৎ বা মহান কোনোটাই নই। তবে আমি চাই, এ পৃথিবীর সবাই হবে মহৎ ও মহান। অন্যায়, অনাচার, অসৎ কাজকে সব সময় পরিহার করে চলবে! মানুষ হয়ে মানুষ ভালবাসবে মানুষকে।

পুলিশ সুপার মিঃ আমিনুর খান ও আহসান নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে দেখে বনহুরকে।

বনহুর নিজে তাদের দু'জনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেয় তাদের নিজ নিজ বাড়িতে।

আহসান আর আমিনুর খান মুক্তি পেয়ে নতুন জীবন লাভ করলো যেন। দস্যু বনহুরের হাতে বন্দী হয়ে তারা যে ছাড়া পাবে সে আশা ছিলো না। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলো তারা দু'জনা, কারণ তাদের পূর্বে যারা দস্যু বনহুর হস্তে আটকা পড়েছে তাদের যে অবস্থা হয়েছে তারা সব স্বচক্ষে দেখেছে—পথে-ঘাটে পাওয়া গেছে তাদের বিকৃত লাশ।

সেদিনের সেইসব হত্যালীলা দেখার পর মিঃ আমিনুর খান ও আহসান ভাবতে পারেনি জীবন নিয়ে ফিরে আসবে বা আসতে পারবে। আজ তারা বনহুরকে আন্তরিক মোবারকবাদ না জানিয়ে পারে না।

বনহুরের একান্ত অনুগ্রহেই বেঁচে গেলো তারা।

মনিরা এবং মায়ের সঙ্গে দেখা করার সময় আর হয়ে উঠলো না বনহুরের, সে নূরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে রহমান বা কাউকে নিলো না সে সাথী হিসাবে।

ফিরে এলো বনহুর নীল দ্বীপে।

নীল দ্বীপে এসে বনহুর সমগ্র দ্বীপটা চষে ফেলল তন্ন তন্ন করে। কোথাও নূরীকে খুঁজে পেলো না।

নানা বেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বনহুর কিন্তু নূরীর সন্ধান পেলো না। কোথায় গেলো তবে সে, বনহুর মুষড়ে পড়লো একেবারে।

একদিন ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটা গাছের নিচে বসে আছে বনহুর, এমন সময় একদল সাপুড়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো দ্বীপের শহরাঞ্চলের দিকে। পিঠে সাঁপের ঝাঁকা, কারো বা কাঁধে।

বনহুর গাছের নিচে বসে নূরীর কথা ভাবছিলো......তাকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। না জানি সে এখন কোথায় কেমন অবস্থায় আছে। নীল দ্বীপের বহু স্থানে খুঁজেছে সে তাকে কিন্তু কোথাও পায়নি। তবে সব জায়গা এখনো তার খুঁজে দেখা হয়নি। নীল দ্বীপের প্রত্যেকটা বাড়িতে তার যাওয়া সম্ভব নয়। ভাবে বনহুর, হয়তো নূরী কোনো বাড়ির মধ্যে আটক পড়েছে, কাজেই দ্বীপের প্রতিটি বাড়িতে সন্ধান দেওয়া উচিত। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, সাপুড়েদের দিকে এগিয়ে গেলো সে—ভাই, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

সাপুড়ে দল বনহুরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো, একজন বললো—কে তুমি বাছা আমাদের পিছু ডাকছ?

বনহুর এসে দাঁড়ালো সাপুড়েদের সম্মুখে, বললো বনহুর—আমাকে তোমাদের দলে নেবে?

তুমি আমাদের দলে আসবে?

হাঁ, আমার কেউ নেই তাই......

তুমি সাপ খেলা জানো?

জানি।

বেশ এসো। কিন্তু কাজ করতে হবে।

সাপুড়ে দলের একজন বৃদ্ধা বলে উঠলো—অমন যোয়ান মানুষ খেটে খেতে পারো না?

পারি কিন্তু কাজ খুঁজে পাচ্ছি না।

আমাদের সঙ্গে এলে অনেক কাজ করতে হবে, পারবে তো?

পারবো।

সাপের বোঝা বইতে হবে......

তারপর?

সাপ খেলা দেখাতে হবে......

তারপর?

বন থেকে মাঠ সংগ্রহ করতে হবে......

তারপর?

মাঝে মাঝে রান্না করতে হবে......

সব পারব।

বেশ চল তবে আমাদের সঙ্গে হাঁ, আর একটা কথা—তোমার এ পোশাক চলবে না, পোশাক পাল্টাতে হবে। সাপুড়ের পোশাক পরতে হবে।

বেশ, তাই পরবো। বললো বনহুর।

❑

বনহুর মিশে গেলো সাপুড়ে দলের সঙ্গে।

বাড়ি বাড়ি সাপ খেলা দেখানো হলো তার কাজ, কখনও কখনো বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনতে হয় তাকে। সাঁপুড়ে বৃদ্ধা তাকে ছেলের মতো আদর করতে লাগলো।

বনহুর সব বাড়িতে খেলা দেখায়, বিশেষ করে মেয়েদের দিকে তার লক্ষ্য। হঠাৎ নূরীর যদি সন্ধান পায় সেই আশায় তার চোখ দুটো ঘুরে ফিরে চারিদিকে।

একদিন বনহুর পথের মধ্যে সাপ খেলা দেখাচ্ছিলো। মাথায় গামছা বাঁধা, কানে বালা, হাতে বালা, গলায় তাবিজ। ওকে দেখলে ঠিক সাপুড়ে, বলেই মনে হচ্ছে।

ওর চারপাশ ঘিরে অগণিত লোক সাপখেলা দেখছে।

এমন সময় একখানা পাল্কী এসে থামলো সেই ভিড়ের এক পাশে।

পাল্কীর সম্মুখে এবং পিছনে কয়েকজন রাজকর্মচারী। দু'জন রাজকর্মচারী এগিয়ে গেলো সাপুড়ের দিকে, বললো একজন—এই সাপুড়ে, তোমাকে রাজকুমারী ডাকছে।

চমকে মুখ তুললো বনহুর।

রাজকর্মচারীটি বললো—আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না?

বললো বনহুর—পাচ্ছি।

তবে অমন হা করে কি দেখছো?

কোথায় তোমাদের রাজকুমারী?

ঐ তো পাল্কীর মধ্যে।

চলো দেখি। বনহুর রাজকর্মচারীর সঙ্গে এগিয়ে চললো।

পাল্কীখানার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

রাজকর্মচারীটি বললো—রাজকুমারী, এই যে সাপুড়ে এসেছে।

রাজকুমারী বিজয়া মুখ না তুলে বললো—ওকে বলে দাও রাজপ্রাসাদে যেতে। আমি সাপখেলা দেখতে চাই।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কারো হুকুমের চাকর আমরা নই। রাজকুমারী সাপখেলা দেখতে ইচ্ছা করলে এখানেই দেখতে পারেন।

রাজকুমারী বললো—যত টাকা নাও তাই পাবে।

টাকার মোহ আমাদের নেই। যা প্রয়োজন তা হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরে যাবো।

রাজকুমারী এবার উর্দ্ধকণ্ঠে বললো—সহজে যেতে না চাও, বন্দী করে নিয়ে যাবো।

হো হো করে হেসে উঠলো বনহুর, তারপর বললো—বন্দী করতে হবে না, চলো এমনি যাচ্ছি।

রাজকর্মচারীরা ভাবলো সাপুড়ে এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সাপুড়ে সাপের ঝুঁড়ি কাঁধে তুলে নিলো।

পাল্কী বাহকগণ পাল্কী তুলে নিলো কাঁধে।

রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলে ওরা।

রাজকুমারী সাপ-খেলা দেখবে এটা কম কথা নয়। রাজান্তপুরের প্রাচীর ঘেরা এক জায়গায় সাপুড়েকে নিয়ে আসা হলো।

রাজকুমারীর আদেশে সাপুড়ের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি হলো না।

সাপ-খেলা দেখা শেষ হলো, বিদায় চাইলো সাপুড়েবেশী বনহুর।

রাজকুমারী ওকে ডেকে আনলো নির্জন বাগানবাড়ির মধ্যে।

বনহুরকে রাজকুমারী চিনতে পেরেছিলো, নিভৃতে তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো—তিলক, তুমি সাপুড়ে সেজে আমার চোখে ধূলো দিতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারলে না আমার কাছে আত্মগোপন করতে।

বনহুর মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিজয়া বললো—কি, কথা বলছো না যে?

এ্যা।

বলো তোমার এ ছদ্মবশে কেন?

বিজয়া, আমি তোমার কাছে পরাজিত হয়েছি, কারণ তুমি আমার ছদ্মবেশ ধরে নিয়েছে।

তোমার এ ছদ্মবেশের কারণ জানতে পারি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—আমি একজনকে হারিয়েছি, যাকে খুঁজে বের করবার জন্য আমার এই সাপুড়ে ছদ্মবেশ।

কাকে খুঁজতে গিয়ে তুমি এ বেশ ধারণ করেছো তিলক, বলো?

আমার সঙ্গিনী......

বিজয়ার মুখখানা কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলো, আনমনা হয়ে কিছু ভাবলো সে, তারপর বললো—তোমার স্ত্রী?

হুঁ।

তিলক তুমি......না না থাক, আর কোনো কথা আমি জানতে চাই না।

বিজয়া, ওকে হারিয়ে আমি বড় মর্মাহত হয়ে পড়েছি। জানি না সে এখন কোথায়।

বিজয়া তাকিয়ে দেখলো বনহুরের চোখেমুখে একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলো সে তার ব্যথা, বললো—তিলক, আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার মনো কষ্ট আমাকেও দিচ্ছে। আমিও তোমার ব্যথায় ব্যথিত।

সত্যি বলছো রাজকুমারী?

হাঁ তিলক।

তবে আমাকে পারবে সাহায্য করতে?

বলো কি করতে হবে?

এই নীলদ্বীপেই আছে সে যাকে আমি খুঁজে ফিরছি বিজয়া।

তুমি কি করে বুঝলে সে নীলদ্বীপেই আছে?

জানি, কাল সে আমার সন্ধানে নীলদ্বীপে রওয়ানা দিয়েছিলো।

সে নীলদ্বীপে পৌছতে সক্ষম হয়েছে কিনা তাও তো তুমি জানো না।

তা ঠিক, আমিও জানি না।

তবে নীলদ্বীপে সন্ধান করে কি করবে তুমি?

বনহুর আজ কেমন যেন বোবা বনে যায় একেবারে। সত্যি, নূরী নীলদ্বীপে এসে পৌছেছে কিনা সে জানে না। বিজয়ার কথায় মনটা তার দমে যায় মুহূর্তে।

বিজয়া বলে—তিলক, তুমি কিছু ভেবো না, বাবাকে বলে আমি একটা জাহাজ চেয়ে নেবো, সেই জাহাজে চেপে তোমার সঙ্গিনীর সন্ধান করো। কিন্তু একটা শর্ত থাকবে, যতোদিন তুমি তোমার প্রিয়াকে খুঁজে না পাবে ততোদিন আমি তোমার সঙ্গে থেকে তোমাকে সহায়তা করবো।

বনহুর বিজয়ার কথায় খুশি হলো, কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তার মন, বললো—রাজকুমারী, তোমার ইচ্ছামতোই আমি কাজ করবো।

নিশ্চয়ই তুমি খুঁজে পাবে তাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আড়াল থেকে সরে গেলো আশা। এতোক্ষণ সে একটা গাছের অন্তরালে দাঁড়িয়ে বনহুর ও বিজয়ার কথাগুলো শুনছিলো, হাসলো সে মনে মনে।

□

রাজকুমারী বিজয়ার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না মহারাজ হীরন্ময় সেন। তিনি একটি জাহাজ দিলেন তিলককে এবং রাজকুমারীর জিদে তাকেও ওর সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন। মহারাজের বিশ্বাস আছে, দস্যু বনহুর কোনোদিন তাঁর কন্যার প্রতি কোনো অন্যায় করবে না। বিজয়ার ধাত্রীমাতা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য।

বনহুরের মনের অবস্থা ভাল না থাকায় বিজয়া যেভাবে তাকে বললো সেইভাবেই কাজ করে চললো, কারণ তার মনে একটা দারুণ হতাশা দানা বেঁধে উঠেছিলো। নীল দ্বীপে অনেক সন্ধান করেছে তবু সে পায়নি নূরীকে। বনহুরের ধারণা, নূরী নীল দ্বীপ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেনি।

বনহুরের জাহাজ যখন নীল দ্বীপ ত্যাগ করলো তখন একটি নারী নীল দ্বীপ বন্দরে একটা ষ্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে হাসলো। জাহাজখানা অদৃশ্য হলে নারীটি তাদের ষ্টিমার ছাড়ার জন্য আদেশ দিলো।

ষ্টিমার চলেছে।

নারীটি এসে দাঁড়ালো একটি ক্যাবিনের দরজায়, বললো—এসো বোন, এবার বেরিয়ে এসো।

নারীটির আহ্বানে বেরিয়ে এলো নূরী ক্যাবিনের ভিতর থেকে। ডেকে দাঁড়িয়ে বললো—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

তোমাকে যে খুঁজছে তার কাছে।

বললো নূরী—সত্যি তুমি বড্ড হেঁয়ালিভরা মেয়ে। কতোদিন হলো তোমার সঙ্গে মিশছি কিন্তু আজ পর্যন্ত......

আমাকে বুঝতে পারলে না, এই তো?

শুধু তোমাকে নয়, তোমার একটি কথাও আমি ঠিকমতো বুঝতে পারি না। তুমি বড় আশ্চর্য মেয়ে!

তোমার স্বামীর মতো আশ্চর্য নই তবু।

আচ্ছা বোন, একটা কথা আমাকে বলবে?

বলো?

তুমি আমার স্বামীকে কি করে চিনলে আজও কিন্তু বললে না?

একদিন বলবো।

কিন্তু সেদিন কবে আসবে?

হাসলো নারীটি।

নূরীসহ নারীটি এক দ্বীপে এসে পৌঁছলো।

নূরী অবাক হয়ে দেখলো দ্বীপবাসীরা নারীটিকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালো। অদ্ভুত সে দ্বীপবাসিগণ। সভ্য সমাজের কোনো ছোঁয়াই এ দ্বীপে এসে পৌঁছায়নি এখনো। এ দ্বীপের পুরুষরা গাছের ছাল পরে মাথায় এবং কোমরে পাখির পালক দিয়ে আবরণ তৈরি করে পরে।

এ দ্বীপের নারীদের পরনেও গাছের ছাল আর পাখির পালকে তৈরি আবরণ। বুক পিঠ সম্পূর্ণ খোলা, গলায় ঝিনুকের মালা। মাথার চুলগুলো ঝুটি করে বাঁধা।

এ দ্বীপের নারী-পুরুষ সকলেরই চেহারা জমকালো। এরা নূরী এবং নারীটিকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখলো। একটা পাতায় তৈরি কুটিরের মধ্যে নূরীকে আশ্রয় দিলো তারা।

জংলী অসভ্য জাতি হলেও এদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধটা অত্যন্ত সজাগ রয়েছে। নূরী খুশি হলো কিন্তু বুঝতে পারলো না তাকে এ দ্বীপে কেন আনা হয়েছে।

নূরী সেই নারীটির নাম জানতে চাইলে বলেছিলো তার নাম চম্পা। নূরী তাকে চম্পা দিদি বলেই ডাকতো।

চম্পাও ওকে বান্দবীর মত স্নেহ করতো।

নূরী মাঝে মাঝে ভাবতো কে এই মেয়েটি যে তাকে এভাবে রক্ষা করে নিলো, তাকে আশ্রয় দিলো, তার সঙ্গে বান্ধবীর মত ব্যবহার করে চলেছে।

নূরী যখন আনমনা হয়ে ভাবতো, তখন চম্পা হাসিমুখে তার কাছে আসতো, নানাভাবে ওর মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করতো।

এখানে চম্পা জংলী মেয়ের বেশেই নূরীর পাশে পাশে। সুন্দর বাঁশী বাজাতে জানতো চম্পা। নূরীর জেদে সে ওকে কখনও কখনও বাঁশী বাজিয়ে শোনাতো।

কিন্তু কোনো কোনো সময় চম্পা কোথায় যে উধাও হয়ে যেতো নূরী ওকে খুঁজে পেতো না। হয়তো বা কয়েকদিন তার কোনো সন্ধানই থাকতো না।

নূরী এই সময় নিজকে বড় অসহায় মনে করতো। হাঁপিয়ে উঠতো সে, ভাবতো চম্পা তাকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

সেদিন দুপুর বেলা নূরী বসে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছিলো, এমন সময় কে যে কাঁধে হাত রাখলো তার।

চমকে চোখ তুললো নূরী, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—চম্পা!

চম্পা বসলো নূরীর পাশে, ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এলো আরও কাছে—নূরী, এতো করে বলছি তুমি ভেবো না।

নূরী ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, বললো—চম্পা, আর যে আমি পারছি না! সব তো তোমাকে বলেছি......

সত্যি নূরী, তোমার দুঃখে আমিও দুঃখিত! না জানি তোমার জাভেদ কেমন আছে......

জাভেদ নাসরিনের কাছে ভালোই আছে চম্পা, কিন্তু আমার হুর না জানি কোথায় কেমন আছে, কোথায় হারিয়ে গেছে সে! আবার ফুঁপিয়ে উঠে নূরী।

নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চম্পার চোখ দুটো ছলছল হয়ে আসে, নূরীকে সে ইচ্ছা করে বনহুরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উদ্দেশ্য বনহুরকে নিয়ে তার খেল খেলা! যে দস্যুর ভয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তটস্থ সেই দস্যুকে সে নানাভাবে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়ছে। সে বনহুরকে ভালবাসে এবং তাই সে ওকে নিয়ে এতোরকম করতে চায়।

চম্পার চোখেমুখে ফুটে উঠে একটা ব্যর্থ প্রেমের করুণ প্রতিচ্ছবি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সে—বোন, তুমি যার জন্য এতো ভাবছো সে ঠিকই একদিন এসে হাজির হবে। তুমি বিশ্বাস করো সে না এসেই পারে না।

নূরী ওর কথায় সান্ত্বনা খুঁজে পায় না, কতোদিন আর সে প্রতীক্ষা করবে তার জন্য!

এখানে যখন নূরী আর চম্পা বনহুরকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে চলেছে তখন নীল সাগরে মহারাজা হীরন্ময় সেনের দেওয়া জাহাজে স্বয়ং দস্যু বনহুর আর বিজয়া নূরীর সন্ধানে চলেছে।

কোথায় চলেছে জানে না বনহুর দিশেহারার মতো জাহাজখানা এগিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়া বনহুরকে আবেষ্টনীর মত ঘিরে রাখতে চায়, সর্বক্ষণ ওকে আনন্দমুখর করে রাখতে চায় সে।

বিজয়া চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছে—অসীম আকাশ, সীমাহীন জলরাশি; দূরে বহু দূরে একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে। বনহুর গম্ভীর উদাস মনে দাঁড়িয়ে ছিলো, এগিয়ে এলো বিজয়া ওর পাশে—তিলক।

বলো?

ঐ দেখো একটি জাহাজ এদিকে এগিয়ে আসছে।

বনহুর বিজয়ার হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সত্যি একখানা জাহাজ নীলনদ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে।

বিজয়া বললো—তিলক, আমার মনে হয় ঐ জাহাজে সে আছে, যাকে তুমি খুঁজছো।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না, সে বাইনোকুলারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে ছিলো সম্মুখে।

জাহাজখানা এগিয়ে আসছে।

বনহুর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললো জাহাজের গতি কমিয়ে দিতে, কারণ যে জাহাজখানা এগিয়ে আসছে সেটা তাদের জাহাজের পিছন থেকেই আসছে।

ক্যাপ্টেন বনহুরের আদেশ অনুযায়ী জাহাজের গতি কমিয়ে দিলো।

পিছনে জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে দেখা যেতে লাগলো। বিজয়া ক্যাপ্টেনকে বললো—ক্যাপ্টেন, আপনি পিছনের জাহাজখানাকে থামবার জন্য ইংগিত করুন।

ক্যাপ্টেন কথাটা শুনে ভাল মনে করলো না, কারণ এসব জায়গায় মাঝে মাঝে জলদস্যুগণ এভাবে জাহাজে চেপে দস্যুতা করে চলে।

বিজয়া ক্যাপ্টেনকে কড়া আদেশ দিলো।

অগত্যা ক্যাপ্টেন বাধ্য হয়ে পিছনের জাহাজখানাকে থামবার জন্য ইংগিত জানালো।

সম্মুখস্থ জাহাজের ইংগিত পেয়ে পিছনের জাহাজখানার গতি মন্থর হয়ে এলো। তাদের জাহাজের কাছে এসে থেমে পড়লো জাহাজখানা।

বিজয়া বনহুরসহ জাহাজটায় গমন করলো। কিন্তু অবাক হলো তারা, সমস্ত জাহাজে একজন আরোহী বা যাত্রী নেই শুধু জাহাজের খালাসি ও চালকগণ ছাড়া।

বিজয়া বললো—তোমাদের জাহাজে কেউ নেই?

বললো একজন খালাসি—আছে, আমাদের রাণী।

রাণী! বললো বনহুর।

খালাসি জবাব দিলো—হুঁ।

বিজয়া বললো—কোথায় তোমাদের রাণী চলো তার কাছে আমরা যেতে চাই। এসো তিলক!

খালাসি এগুলো।

তাকে অনুসরণ করলো বনহুর আর বিজয়া।

বনহুর ইচ্ছা করেই বিজয়ার কাছে নিরীহ বেচারী বনে থাকে, নিজেকে সে প্রকাশ করতে চায় না ওর কাছে। বিজয়ার অনুগত বান্দার মতোই থাকে সে।

বিজয়া তিলকসহ খালাসীর পিছু পিছু এগিয়ে চললো।

একখানা ক্যাবিনের সম্মুখে এসে থামলো খালাসি, বিজয়া আর বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

ভিতরে চলে যায় খালাসি, একটু পরে ফিরে আসে—চলুন।

বিজয়া আর বনহুর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো একবার।

বিজয়া প্রথমে পরে বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। অবাক হয়ে দেখলো তারা, ক্যাবিনে সুসজ্জিত শয্যায় অর্ধশায়িত এক যুবতী—মাথায় মুকুট, গলায় মুক্তার মালা, সমস্ত দেহে মূল্যবান অলঙ্কার। কিন্তু আশ্চর্য, যুবতীর মুখমণ্ডল বিকৃত, এক চক্ষু মুদ্রিত, মুখে অসংখ্য গুটির দাগ।

ক্ষুদে চোখ মেলে পিট পিট করে তাকালো রাণী, হঠাৎ হেঁড়ে গলায় বলে উঠলো—কে তোমরা? কি চাও আমার কাছে?

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছিলো ভয়ঙ্করী নারীমূর্তিটাকে।

বিজয়াই জবাব দিলো—আমরা পথ হারিয়েছি, তাই আপনার জাহাজ থামিয়ে......

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পথের নির্দেশ জানতে এসেছো? বললো সেই অদ্ভুত রাণী।

এবারও জবাব দিলো বিজয়া—হাঁ, আপনি যদি......

বুঝেছি, সব তোমাদের চালাকি। বলো কোন্ সাহসে তোমরা আমার জাহাজের গতিরোধ করেছো?

এবার বনহুর কথা বললো—আমরা জানতাম না এ জাহাজখানা আপনার।

জানতে না! কেন, জাহাজের সম্মুখে যে পতাকা উড়ছে তাও তোমরা চেনো না।

এতোক্ষণে মনে পড়লো বনহুর এবং বিজয়ার, জাহাজখানার সম্মুখে একটি পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে দেখেছে তারা।

বললো বনহুর—হাঁ দেখেছি কিন্তু আমরা চিনি না।

চেনো না, এবার মজাটা টের পাবে। আমার চলার পথে বাধা দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।

বিজয়া অদ্ভুত নারীটির কথা বলার ভঙ্গী দেখে না হেসে পারলো না।

বনহুর গম্ভীর হয়ে বললো—মাফ করে দিন, আমরা ভুল করেছি......

ভুল করেছো—এ্যা, কি বললে ভুল করেছো। হঠাৎ রাণী শয্যার শিয়রে একটা সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আর বিজয়ার চরপাশে একটা লৌহ সিক পরিবেষ্টিত দেয়াল ঘিরে ফেললো।

এতো দ্রুত দেয়ালটা বনহুর আর বিজয়ার চারপাশে উঁচু হয়ে উঠেছিলো যে ওরা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বন্দী হয়ে পড়লো।

বনহুর আর বিজয়ার বস্ত্রাভ্যন্তরে অস্ত্র লুকানো থাকা সত্ত্বেও তারা কিছু করতে পারলো না।

এইবার বনহুর বুঝতে পারলো যতো সহজ মনে করেছিলো তারা এই নারীকে ততো সহজ সে নয়। বনহুর অধর দংশন করলো।

বিজয়ার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে পড়লো মুহূর্তে।

হঠাৎ তার কানে এলো নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি। বিজয়া তাকিয়ে দেখলো সেই অদ্ভুত নারী হেসে চলেছে তাদের অবস্থা লক্ষ্য করে।

বনহুরও চোখ তুললো কিন্তু কোনো কথা বললো না।

বীভৎস নারীটি তখনও হেসে চলেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, পরক্ষণেই লক্ষ্য করলো নারীটি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে নেই। সব শূন্য, চারিদিকে নীরব। সম্মুখে কোনো শয্যা বা কোনো নারী দণ্ডায়মান নেই।

বিজয়া আর বনহুর বুঝতে পারলো, যেখানে নারী ও তার শয্যাটি অবস্থিত ছিলে সেই স্থানসহ মেঝেটা জাহাজের নিচের তলায় নেমে গেছে, সেখানে দ্বিতীয় আর একটি মেঝে স্থানটিকে পূর্বের ন্যায় সমতল করে দিয়েছে। তারা আরও লক্ষ্য করলো, তাদের নিয়ে জাহাজখানা দ্রুত চলতে শুরু করেছে।

বনহুরের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠলো, ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠলো। তার মুখমণ্ডল, বনহুর এবার বুঝতে পারলো তাকে বন্দী কারার জন্যই এই জাহাজখানা এভাবে এগিয়ে এসেছে এবং তাকে কোনরকমে তাদের জাহাজে এনে কৌশলে বন্দী করেছে।

বিজয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, তার চোখেমুখে ভীতিভাব ফুটে উঠেছে। সে বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। বনহুরের মুখে একটা কঠিন ভাব লক্ষ্য করলো। সে এমন ভাব লক্ষ্য করেনি কোনোদিন তার মুখে। একটা কঠিন পৌরুষ ভাব বনহুরের মুখখানাকে দৃঢ় করে তুলেছে।

বিজয়া এতো বিপদেও মুগ্ধ বিস্ময়ে বনহুরের দিকে তাকিয়ে রইলো, সহসা সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। সে দেখলো বনহুরের ললাটে রেখাগুলো দড়ির মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দক্ষিণ হস্তখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে। অধর দংশন করছে বনহুর বারবার, যেমন হিংস্র জন্তু খাঁচায় আবদ্ধ হলে তার অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

বনহুর তাকালো বিজয়ার দিকে।

বিজয়ার সঙ্গে বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হতেই বিজয়া স্তম্ভিত হলো—কই, সে তো কোনোদিন তাকে এমন কঠিন হতে দেখেনি। সে দেখেছে তিলকের মতো সুন্দর অপূর্ব কোনো পুরুষ হয় না, অমন কোমলপ্রাণও বুঝি কারো নেই। কিন্তু আজ বিজয়ার সে ভুল ভেঙ্গে গেলো—তিলক শুধু মানুষই নয়, সে একটি পৌরুষদীপ্ত পুরুষ। আজ বিজয়ার মন দস্যু বনহুরের কাছে নত হয়ে এলো। ধীরে ধীরে সরে এলো বনহুরের কাছে—তিলক, একি হলো?

বিজয়ার কথায় বনহুর কোনো জবাব দিলো না, সে মনে মনে ভীষণভাবে ফুলছিলো।

জাহাজখানা তখন স্পীডে এগিয়ে চলেছে।

কোথায় কোন্ দিকে চলেছে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

বদ্ধ খাঁচায় বন্দী হিংস্র সিংহের মত ফোঁস ফোঁস করছে বনহুর। এমনভবে হঠাৎ সে বন্দী হবে ভাবতেও পারেনি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো বনহুর—বিজয়া, এ আমার চরম পরাজয়।

বিজয়া বলে—এমন হবে ভাবতে পারিনি তিলক। আমি জানতাম না, এ জাহাজে আমাদের জন্য এমন একটা বিপদ ওঁৎ পেতে ছিলো। কি ভয়ঙ্কর ঐ নারীটি......

যত ভয়ঙ্করই হোক আমি তাকে......

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি জেগে উঠে সেখানে।

চমকে ফিরে তাকায় বিজয়া আর বনহুর, তারা দেখতে পায় সেই বিকৃত মুখাকৃতি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের শিকঘেরা দেয়ালের পাশে।

বনহুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়।

নারীমূর্তিটি এবার হেঁড়ে গলায় বলে উঠে—কেমন জব্দ হলো? আমার জাহাজে এলে তাদের এই অবস্থা হবে। জানো আমি কে?

বনহুর কিছু বলার পূর্বেই বলে উঠে বিজয়া—জানি তুমি একটি শয়তানী।

না, আমি হিন্দের রাণী।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো সেই নারীমূর্তির দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হিন্দ!

হাঁ, আমি সেই দ্বীপের রাণী।

বললো বনহুর—আমাদের এভাবে বন্দী করে তোমার লাভ কি?

হিন্দে পৌঁছেই বুঝতে পারবে। হাঁ, উপযুক্ত লোক এবার পেয়েছি।

তুমি কি বলছো হিন্দ রাণী?

বলছি আমদের পুরোহিত ঠাকুর তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে পেলে খুব খুশি হবেন।

পুরোহিত ঠাকুর!

হাঁ, তিনি তোমাদের পেলে তার পূজার কাজ সমাধা করবেন। কারণ তিনি একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর সন্ধান করে চলেছেন অনেক দিন থেকে।

বিজয়া বনহুরের মুখের দিকে তাকালো।

বনহুর বুঝতে পারলো তাদের স্বামী-স্ত্রী বলায় সে একেবারে বিস্মিত হয়ে পড়েছে।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো—ও আমাদের সম্বন্ধে কিছু জানে না তাই!

চলে গেলো সেই অদ্ভুত নারী।

বিজয়া বললো—এখন কি হবে তিলক?

মরতে হবে!

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বিজয়া।

বনহুর বলে—আমার উপকার করতে এসে তোমার এই অবস্থা হলো বিজয়া।

তিলক, আমার জন্য আমি ভাবছি না, ভাবছি তোমার জন্য। সত্যি তোমার এই দেব সমতুল্য জীবনটা বিনষ্ট হবে......

বনহুর হাসলো একটু।

কিন্তু কতোক্ষণ এভাবে বন্দী হয়ে থাকা যায়।

অস্থির হয়ে উঠে বনহুর। শিকগুলো সে পরীক্ষা করে দেখে, তারপর মেঝের তক্তার উপর বসে পড়ে।

জাহাজখানা তখন স্পীডে চলেছে।

একটানা ঝক্ঝক্ শব্দ আর নীলনদের জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

বনহুরের অদূরে বসে আছে বিজয়া. ম্লান. বিষণ্নতার মুখমণ্ডল।

বিজয়ার অবস্থা দেখে বনহুরের মায়া হয়। কারণ এ অবস্থার জন্য বনহুরের নিজের তেমন কিছু এসে যায় না; বহুবার তাকে এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু বিজয়া যে রাজকন্যা. চিরকাল সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিত—এ কষ্ট তার সহ্য হবে কেন!

বনহুর ভাবছে কিভাবে বিজয়াকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়। তাদের জাহাজখানা কত দূরে আর কোথায় আছে কে জানে।

জাহাজের একটানা ঝাঁকুনি আর ঝক্ঝক্ শব্দে বিজয়ার তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো, কখন যে শিকের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে খেয়াল নেই তার।

বনহুরের চোখে কিন্তু ঘুম নেই, সে নীরবে ভাবছে এখন সে কি করবে। নূরীর সন্ধানে এসে নিজে আটকা পড়ে গেলো। না জানি নূরী এখন কোথায় কিভাবে আছে। নূরীর কথা মনে পড়তেই তার দৃষ্টি চলে গেলো বিজয়ার দিকে। সেই মুখখানা ভেসে উঠলো তার দৃষ্টি সম্মুখে। কতোদিন নূরীকে দেখেনি বনহুর। ধীরে ধীরে উঠে বনহুর এগিয়ে আসে বিজয়ার পাশে।

নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে বনহুর তাকিয়ে দেখছে বিজয়ার মুখ, ভুলে যায় বনহুর তার বন্দী অবস্থার কথা। ডান হাতখানা রাখে সে বিজয়ার চিবুকে।

সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ার নিদ্রা ছুটে যায়।

সোজা হয়ে বসে বলে বিজয়া—তিলক!

মুহূর্তে নূরীর মুখখানা মুছে গিয়ে বিজয়ার মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠে বনহুরের চোখে. দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যায় বনহুর।

বিজয়া বনহুরের হাত ধরে বলে—যাচ্ছো, বসো?

না. তুমি ঘুমাও।

তিলক!

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বিজয়া?

বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।

ঘুমাও।

কিন্তু কি করে ঘুমাবো—বালিশ নেই, বিছানা নেই........ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বিজয়ার কণ্ঠ।

সত্যি তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। রাজকুমারী তুমি, কোনোদিন এ অবস্থায় পড়োনি কিনা!

বিজয়া নীরবে বসে রইলো, নিদ্রায় চোখ দুটো মুদে আসছে তার।

বনহুর বললো—বিজয়া, যদি তোমার কোনো অসুবিধা না হয় তবে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে পারো।

তোমার কষ্ট হবে না?

একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে, বললো—পুরুষ মানুষের আবার কষ্ট! আমরা সব সহ্য করতে পারি।

বিজয়ার বড্ড ঘুম পাচ্ছিলো, সে নিজকে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলো না, বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

গভীর আবেশে চোখ মুদলো বিজয়া, এতো বিপদেও সে যেন নিশ্চিন্ত হলো। ঘুমিয়ে পড়বে ভেবেছিলো কিন্তু বিজয়া ঘুমাতে পারলো না আর। একটা অপূর্ব অনুভূতি তার সমস্ত মনে আর শিরায় শিরায় আলোড়ন জাগালো। চোখ মুদে থাকলেও ঘুম আর এলো না তার।

বিজয়া ভাবতে লাগলো আজ তার জীবন সার্থক হলো, চিরদিন যদি সে এমনি করে তিলকের কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে পারতো—পৃথিবীর সবকিছু সে ত্যাগ করতে পারতো, রাজ-ঐশ্বর্যের মোহ তাকে অভিভূত করতে পারতো না কোনোদিন।

বিজয়া যখন এসব কথা ভাবছে তখন বনহুর ভাবছে কেমন করে এখান থেকে বেরুনো যায়। তাকে কেউ কোনোদিন আটকে রাখতে পারেনি আর আজ সে বন্দী হয়ে থাকবে!

একসময় ঘুমিয়ে পড়ে বিজয়া।

বনহুরও শিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

জাহাজের একটানা ঝক্ঝক্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে যায় বিজয়ার, চোখ মেলে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে তিলক ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে ও কোল থেকে মাথাটা তুলে নেয় সে, উঠে বসে নির্বাকে দৃষ্টি মেলে তাকায় ওর মুখের দিকে।

বিজয়া উঠে বসতেই বনহুরের নিদ্রা ছুটে যায়, সে চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসলো, বললো—ঘুম হলো?

বিজয়া বললো—হাঁ!

কতক্ষণ নীরবে কাটলো উভয়ের।

রাত এখন গভীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বললো—বিজয়া, তুমি সাঁতার জানো?

বিজয়ার মুখ কালো হয়ে উঠলো, বললো সে—না, আমি সাঁতার জানি না তিলক।

হেসে বললো বনহুর—জানি রাজকুমারীরা সাঁতার জানে না। কিন্তু আমাদের পালানোর একটিমাত্র পথ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া........

ওঃ, কি ভয়ঙ্কর কথা!

ভয় পাচ্ছো বিজয়া, কিন্তু এ ছাড়া বাঁচবার কোনো উপায় নেই।

বিজয়া কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—এ লৌহশিক বেষ্টিত দেয়াল কি করে ভেদ করবে তিলক?

আমি যা বলবো যদি করতে পারো তাহলে........

পারবো।

এই গভীর রাতে সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে রাজকুমারী?

পারবো তিলক, তোমার হাত ধরে আমি আগুনের আত্মসমর্পণ করতে পারবো।

বনহুর বললো—বেশ, তাহলে তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও—হয় মৃত্যু, নয় জীবন।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে গেলো সে তাদের চারপাশে ঘেরা শিকের দেয়ালের দিকে।

বিজয়াও উঠে পড়েছে, সে তাকিয়ে দেখছে কি করে তিলক।

বনহুর শিকগুলোর উপর হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখলো তারপর দু'হাতে ভীষণ জোরে চাপ দিলো, ধীরে ধীরে শিকগুলো বাঁকা হয়ে আসছে।

বিজয়ার দু'চোখ বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে উঠলো। তিলক মানুষ না কি! এতো শক্তি কোনো মানুষের শরীরে হয়। অবাক হয়ে দেখলো শিকগুলো বাঁকা হয়ে গেছে একপাশে।

বনহুর বললো—বিজয়া, শীঘ্র চলে এসো।

বিজয়া বনহুরের কথামতো কাজ করলো।

বনহুর আর বিজয়া বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। অন্ধকারে আত্মগোপন করে এগুতে লাগলো পিছনে ডেকের দিকে।

বনহুর আর বিজয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়ালো পিছনের ডেকে।

বিজয়ার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

সম্মুখ ডেক থেকে কিছুটা আলো পিছন ডেকের কিছু অংশ আলোকিত করেছিলো। বনহুর আর বিজয়া সতর্কভাবে সেই আলো পরিহার করে ডেকের কিনার ধরে যেখানে কয়েকটা বোট বাঁধা আছে, সেখানে এসে দাঁড়ালো।

আধা অন্ধকারে বনহুর দ্রুতহস্তে বোটগুলোর মধ্য হতে একটি খুলে রশিদ্বারা নামিয়ে দিলো নিচে।

বিজয়া অবাক দৃষ্টি নিয়ে দেখছে বনহুরের কার্যকলাপগুলো। যতো দেখছে ততোই যেন বিজয়া অভিভূত হয়ে পড়ছে। আরও বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে সে।

বনহুর বোট নামিয়ে নিয়েছে, এবার বললো—বিজয়া, তুমি এই রশি ধরে ধীরে ধীরে বোটে নেমে চলো, আমি তোমাকে সাহায্য করছি......

বনহুরের কথা শেষ হয় না একটা হাসির শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আর বিজয়ার চারপাশ ঘিরে দাঁড়লো প্রায় বিশ-পঁচিশ জন লোক, সকলের হাতেই বল্লম আর বর্শা।

বনহুর ভাবতে পারেনি এমন একটা অবস্থা হবে।

সে ভড়কে না গেলেও একটু হতভম্ব হয়ে পড়লো। জাহাজের ডেক না হয়ে যদি ভূপৃষ্ঠ হতো তাহলে বনহুর এতো দমে যেতো না। বুঝতে পারলো এদের কবল থেকে সে পালাতে পারে, এদের কাবু করাও তার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে না, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটি নারী। বিজয়াকে বিপদের মুখে ফেলে তার পালানো কিছুতেই সম্ভব নয়। বিজয়া তার মঙ্গল কামনা করেই সঙ্গে এসেছিলো, তার জন্যই সে বিপদে পড়েছে। কিন্তু এসব ভাববার সময় নেই বনহুরের। সম্মুখ তাকিয়ে দেখলো সেই নারীটি তার ক্ষুদে একটি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো এবার হিন্দুরাণী—খুব তো পালানো হচ্ছিলো—এবার মজাটা কেমন টের পাবে! এই, তোমরা ওকে আর সঙ্গিনীটিকে বন্দী করে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো ওরা।

হিন্দরাণী আবার হেসে উঠলো, বললো—কেমন মজা হলো দেখো! আর পালাবে?

বনহুরের হাতে এবং মাজায় লৌহশিকল পরিয়ে তাকে বেঁধে ফেলা হলো।

বিজয়ার হাতেও শিকল পরিয়ে বেঁধে ফেললো হিন্দরাণীর অনুচরদল।

বনহুর আর বিজয়া সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছে, এই শূন্য জাহাজে কোথায় এতোগুলো অনুচর আত্মগোপন করেছিলো! কি মতলব নিয়েই বা ওরা নীলনদে এমন অভিযান চালিয়ে চলেছে!

বনহুর আর বিজয়াকে নিয়ে হিন্দরাণীর অনুচরগণ এবং স্বয়ং হিন্দরাণী ফিরে এলো সেই ক্যাবিনে যে ক্যাবিন থেকে ওরা পালাতে সক্ষম হয়েছিলো।

বনহুর আর বিজয়াকে এনে দাঁড় করানো হলো।

হিন্দরাণী হেঁড়ে হলায় কঠিন কণ্ঠে বললো—আমার এই লৌহখাঁচার শিক কি করে তুমি বাঁকালে বলো?

বনহুর হাত দু'খানা দেখিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—এই হাত দিয়ে।

আশ্চর্য তোমার হাত দু'খানা যুবক।

বনহুর আবার জবাব দেয়—শুধু আমার হাত দু'খানাই আশ্চর্য নয় হিন্দরাণী, আমি নিজেও আশ্চর্য মানুষ......

বটে!

হুঁ।

কারণ?

কারণ তোমার সাধ্য নয় আমাকে বন্দী করে রাখো।

কি বললে তুমি?

যা বললাম সত্য।

আচ্ছা দেখা যাবে কি করে তোমরা এবার পালাও। শুধু লৌহখাঁচার আবদ্ধ নয়, লৌহশিকলে তোমার হাত দু'খানা শক্ত করে বাঁধা থাকবে, আর থাকবে তোমার চারপাশে মজবুত লৌহদেয়াল।

কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো হিন্দরাণী।

হিন্দরাণীর অনুচরগণ লৌহশিকলে আবদ্ধ বনহুর আর বিজয়াকে বন্দী করে রাখলো। বনহুরের হাত দু'খানা লৌহশিকলে মজবুত করে বাঁধা, মাজায় লৌহশিকল। এবার যেন পালাতে না পারে সেজন্য হিন্দরাণীর সর্তকতার সীমা রইলো না।

❑

এক রাত এক দিন কেটে গেলো!

খাবার নিয়ে এলো একজন খালাসি।

ক্যাবিনে বন্দী করার পর বিজয়ার বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছিলো হিন্দরাণী।

খাবার এনে বনহুরের সম্মুখে রাখলো বিজয়া, নিজের খাবার খেতে শুরু করলো সে। কিছুটা খাবার খাওয়ার 'পর মুখ তুলতেই দেখলো বনহুর নীরবে বসে আছে। খাবার সে খাচ্ছে না।

বিজয়া বললো—তিলক, তুমি খাচ্ছো না কেন?

বনহুর তাহার লৌহশিকলে আবদ্ধ হাত দু'খানার দিকে তাকালো।

বিজয়া বুঝতে পারলো ওর হাত দু'খানা বদ্ধ থাকায় সে খেতে পারছে ন। বিজয়া এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে. ওর খাবারের থালটা তুলে নিলো হাতে, বললো—তিলক, আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি।

থাক, তোমার কষ্ট করতে হবে না বিজয়া। তুমি নিজে খাওগে, যাও।

আমি খাবো আর তুমি না খেয়ে থাকবে?

ক্ষুধা আমার নেই বিজয়া।

জানি ক্ষুধা তোমার আছে 'কিনা, কাল থেকে কিচ্ছু মুখে দাওনি।

তুমিও তো কিছু খাওনি।

আমরা মেয়েমানুষ, অনেক সহ্য করতে পারি। নাও, এবার খাও দেখি। বিজয়া খাবার তুলে দিতে থাকে বনহুরের মুখে।

বনহুর অগত্যা খেতে শুরু করলো। বিজয়ার হাতে খাবার খেতে খেতে বনহুরের মনে পড়লো মনিরার কথা। এমনি করে মনিরাও তাকে কতোদিন খাবার মুখে তুলে খাইয়েছে। ওর চোখের সামনে মনিরার মুখখানা ভেসে উঠলো।

বনহুর নিষ্পলক নয়নে বিজয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিজয়া মনে করে তিলক বুঝি তাকে ভালবেসে ফেলেছে। এর পূর্বেও সে এমনি একটা ভাব লক্ষ্য করেছে ওর মধ্যে। তিলক ওকে কাছে পেলে কেমন যেন অভিভূত হয়ে যায়, তবে কি সত্যি সে তাকে ভালবাসে?

বিজয়া বলে—তিলক, অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো?

বিজয়ার প্রশ্নে বনহুরের সম্বিৎ ফিরে আসে, তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সে—কিছু না বিজয়া।

তিলক, সত্যি করে একটা কথা বলবে?

বলো?

তুমি আমাকে ভালবাস কিনা আমি জানতে চাই তিলক?

বনহুরের চোখ দুটো স্থির হলো বিজয়ার মুখে, কোনো জবাব দিলো না সে বিজয়ার প্রশ্নের।

বিজয়াও এরপর আর কিছু বললো না। সে নীরবে ওর মুখে খাবারগুলো তুলে দিতে লাগলো।

খাওয়া শেষ হলো বনহুরের।

এবার বিজয়া নিজের খাবারে হাত দিলো।

নির্জন ক্যাবিনে এমনি করে কতোক্ষণ কাটবে ওদের! বনহুরের সান্নিধ্য বিজয়ার মন্দ লাগে না, কিন্তু দুঃখ হয় বনহুরের লৌহশিকলে আবদ্ধ হাত দু'খানার দিকে তাকিয়ে।

বনহুরের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের নিচে কালো রেখা পড়ে গেছে। এমনভাবে বন্দী হয়ে থাকার জন নয় বনহুর। সে অস্থির হয়ে পড়ে একেবারে। কি করে এখান থেকে সে মুক্ত হবে, এ নিয়ে তার গভীর চিন্তা।

বিজয়া তেমন করে দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়েনি, তিলক পাশে থাকলে সে সবকিছু মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারে। তিলক যে ওর মনোবল, অনাবিক সুখ-শান্তি—তিলক যেন তার সবকিছু। বিজয়া জানে, তিলককে সে পাবে না কোনোদিন তবু ওতে ভাল লাগে ওর। বিজয়া রাজকুমারী হয়েও শুধু তিলকের জন্য আজ এই কষ্ট-ব্যথা-বেদনাকে আনন্দে গ্রহণ করেছে। পিতার কাছে অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলো সে করজোড়ে।

মহারাজ হীরন্ময় কন্যার আব্দার মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানেন তিলকের আসল পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, সে কেমন তাও তিনি মনেপ্রাণে জানতেন। আর জানতেন বলেই তার সঙ্গে কন্যাকে ছেড়ে দেবার সৎসাহসী হয়েছিলেন। তবু বিজয়ার ধাত্রীমা এবং পুরোন দাসীটিকেও সঙ্গে দিয়েছিলেন। তারা সর্বক্ষণ বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো।

আজ তারা কেউ নেই, তারা সেই জাহাজে যে জাহাজ থেকে তারা এই অজানা জাহাজখানায় পা বাড়িয়েছিলো। ঐ জাহাজে কয়েকজন বান্ধবীও ছিলো বিজয়ার কিন্তু সবাই রয়ে গেছে, আজ তার পাশে কেউ নেই একমাত্র তিলক ছাড়া।

বিজয়া তিলককে পাশে পেয়ে ভুলে গেছে সব বিপদের কথা। একান্ত নিবিড় করে পেয়েছে আজ সে ওকে, এমন করে সে ওকে কাছে পাবে কোনোদিন ভাবতে পারেনি। তিলকের প্রতি তার গভীর বিশ্বাস আছে।

দু'হাতে লৌহশিকল, মাজায় লৌহশিকল, বড় কষ্ট হচ্ছে তোমার, না? বললো বিজয়া।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো বনহুর—এসব আমার অভ্যাস আছে বিজয়া, কাজেই কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট হচ্ছে তোমার।

না আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

বিজয়া, রাত অনেক হয়েছে, এবার ঘুমাও। যদি অসুবিধা হয় আমার কোলে মাথা রেখে শুতে পারো।

রোজ তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাবো আর তুমি লৌহশিকের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে ঘুমাবে। একদিন তুমি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাও তিলক।

না, তা হয় না।

কেন? কেন হয় না তিলক?

আমার তো কোনো অসুবিধা হয় না ঘুমাতে।

জানি। আমি সব জানি। তিলক, এসে আমার কোলে মাথা রেখে তুমি ঘুমাও, এসো......

বনহুর নীরব।

বিজয়া বনহুরের কাঁধে হাত রাখলো—শোও।

এবার বনহুর না করাতে পারলো না। যদিও সে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলো, বিশেষ করে বিজয়ার কোলে মাথা রেখে শোয়াটা তার মোটেই উচিত হচ্ছে না, তবু সে বাধ্য হয়েই চোখ বন্ধ করে রইলো।

বিজয়া ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে আঙ্গুল চালিয়ে চললো।

একসময় বনহুর ঘুমিয়ে পড়লো।

বিজয়ার চোখে ঘুম নেই, সে বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে। কতোদিনের কতো কথা ভেসে উঠে তার মনের আকাশে। তিলক যেদিন প্রথম এসেছিলো তাদের রাজপ্রাসাদে......তার পিতা যখন প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ওর সঙ্গে......প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েই বিজয় আত্মসমর্পণ করেছিলো ওর কাছে। সেদিন বিজয়া জানতো না তিলককে পাওয়া এতো কষ্টকর। ভেবেছিলো ওকে সে সহজেই আপন করে নেবে। জয় করে নেবে ওর সমস্ত সত্তাকে.....কিন্তু ক'দিন পরই বিজয়া বুঝতে পেরেছিলো তিলককে যতো সহজ মনে করেছিলো, সে ততো সহজ নয়। তিলকের পরিচয় বিজয়া জানতে পারলো যখন তখন সে তিলককে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো। কিন্তু সে তখনো জানতো না ওকে সে পাবে না কোনোদিন......

বিজয়ার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

বনহুর চোখ মেলে তাকায়—বিজয়া, তুমি কাঁদছো!

তাড়াতাড়ি চোখের পানি হাতের পিঠে মুছে নিয়ে বলে বিজয়া—কই, না তো?

বনহুর নিজের ললাট থেকে বিজয়ার চোখের গড়িয়ে পড়া পানি হাতের তালুতে মুখে তুলে ধরে—এই তো; তাছাড়া চোখ মুছলে কেন বলো? বুঝেছি তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব।

না।

এবার আমি বসি তুমি ঘুমাও বিজয়া।

ঘুম আমার পায়নি তিলক।

কত রাত হয়েছে তবু ঘুম পায়নি?

না।

মিছে কথা বলছো বিজয়া।

সত্যি আমার ঘুম পায়নি।

বনহুর তবু বিজয়ার কোল থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে, তারপর বলে—বিজয়া, একটা কথা বলবো কিছু মনে করবে না তো?

বলো?

জানি তুমি আমাকে ভালবাসো বিজয়া, আমিও তোমার ভালবাসাকে অভিনন্দন জানাই। তোমার পবিত্র ভালবাসার কথা আমি কোনোদিনই ভুলবো না।

বিজয়ার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে অশ্রুধারা।

❑

একসময় জাহাজখানা একটা দ্বীপে এসে পৌঁছে যায়।

জাহাজখানা দ্বীপে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢাকের আওয়াজ কানে ভেসে এলো বনহুর আর বিজয়ার।

অল্পক্ষণেই সেই হিন্দরাণী এসে দাঁড়ালো, তার পিছনে বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দ অনুচর। প্রত্যেকের হাতেই সূতীক্ষ্ণধার বল্লম আর বর্শা।

হিন্দরাণীর আদেশ অনুযায়ী তার অনুচরগণ বনহুরকে লৌহশিকলে মজবুত করে বেঁধে চারপাশ পরিবেষ্টিতভাবে নামিয়ে নিয়ে চললো। বিজয়াকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে জাহাজ থেকে নামানো হলো।

অবাক হয়ে দেখলো বনহুর আর বিজয়া, অসংখ্য হিন্দ দ্বীপবাসী জাহাজখানার পাশে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দরাণী নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত হিন্দবাসী মাথা নত করে অভিনন্দন জানালো।

হিন্দরাণী এক চক্ষু মেলে তাকালো তার হিন্দদ্বীপবাসী ভক্তগণের দিকে, তারপর হাত তুলে আশীর্বাদ জানানোর মতো ভঙ্গী করলো।

বনহুর আর বিজয়া অবাক হয়ে দেখতে লাগলো তাদের কার্যকলাপগুলো।

হিন্দ দ্বীপবাসী নারী-পুরুষ সবাই জংলীদের মতো অসভ্য। কারণ তাদের দেহে তেমন কোনো পোশাক-পরিচ্ছদ নেই। একখণ্ড কাপড় নেংটা আকারে পরা. গায়ের স্থানে স্থানে লোহা এবং তামার অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। মাথার চুলগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কাটা।

বিজয়া আর বনহুর অবাক হলো হিন্দ দ্বীপের নারীগণকে দেখে। নারীগুলো প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলা চলে। সামান্য গাছের ছাল দিয়ে শুধু লজ্জা নিবারণ করেছে। বুক এবং শরীর খোলা। মাথার চুলগুলো পুরুষদের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা। প্রায় নারীরই একটি চোখ মুদিত এবং মুখে অসংখ্য দাগ। ঠোঁটগুলো কারো বা বাটির মতো মোটা. কারো বা থালার মত চ্যাপ্টা।

বিজয়া অবাক হয়ে গেছে একেবারে। বিশেষ করে হিন্দ রাণীর সঙ্গে এদের বেশ মিল রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিস্ময় জাগলো তাদের মনে, এ দ্বীপের নারীরা সবাই এক চক্ষুহীন।

কোনো কোনো নারীর ঠোঁটের মধ্যে বিরাট ফুটো বা ছেঁদ।

কারো কারো ঠোঁট ঝুলে বুকের উপর নেমে এসেছে। সেকি বীভৎস ভয়ঙ্কর চেহারা!

বনহুর আর বিজয়াসহ হিন্দরাণী রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলো। সে প্রাসাদ ইট-বালি-চুন-সিমেন্টে তৈরি নয়. গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বিরাট জায়গা।

বনহুর আর বিজয়াকে একটা কাঠের ঘেরাও করা জায়গায় আটকে রাখা হলো।

একচক্ষু বিশিষ্ট হিন্দরাণী কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে চলে গেলো রাজ-অন্তঃপুরে।

বিজয়া বললো—তিলক, এসব কি দেখছি?

বনহুর বললো—এরা হিন্দ দ্বীপবাসী। এরা জংলীদের চেয়েও বেশি অসভ্য। এদের পুরুষ এবং নারী অদ্ভুত ধরনের। যে নারীর দেহে যতো বেশি ক্ষতচিহ্ন থাকবে সে ততো বেশি সুন্দরী। এদের বিশেষ একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে, প্রায় নারীরই একটি চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি হিন্দরাণীরও একটি চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে।

কি সর্বনাশ!

তুমি এটাকে সর্বনাশ বলছে বিজয়া, কিন্তু এটা ওদের আনন্দের কথা। ওরা সুন্দরী হবার জন্য যে কোনো কষ্টকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারে।

কি ভয়ঙ্কর নৃশংস কথা!

ঐ দেখছো না ওদের মুখে অসংখ্য ফুটো ছিদ্রের মত দাগ, ওগুলো ওরা মুখে ইচ্ছে করে তৈরি করে নিয়েছে। আর ওদের ঠোঁটে যে বড় ছিদ্র দেখছো ওগুলো তৈরি করতে এসব মেয়ের আরো কষ্ট করতে হয়।

অবাক হয়ে বললো বিজয়া—তার মানে?

মানে যখন ওরা ছোট বা শিশু থাকে তখন ওদের ঠোঁটে অগ্নিদগ্ধ সরু লৌহশলাকা দিয়ে ক্ষুদ্র ফুটো বা ছিদ্র করে তার মধ্যে কাঠি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর?

তারপর কয়েক মাস পরে সেই কাঠি বের করে পুনরায় ওর চেয়ে একটু মোটা কাঠি সেই ফুটোর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। এমনি করে মাসের পর মাস ওরা ঠোঁটের ছিদ্রপথে একটু করে মোটা কাঠি প্রবেশ করাতে থাকে।

সত্যি বলছো তিলক?

হাঁ, তার প্রমাণ দেখতেই পাচ্ছো। পরিশেষে এইসব নারীর নিচের ঠোঁট ঝুলে বুকের নিচে নেমে আসে এবং তারাই হয় এদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

এতো দুঃখেও হাসি পায় বিজয়ার।

বনহুর আর বিজয়াকে ওরা কাঠের প্রাচীরঘেরা বন্দীশালায় বন্দী করে রাখলো। ফলমূল খেতে দিলো ওরা, কিন্তু বনহুরের হাত এবং মাজার লৌহশিকল মুক্ত করে দিলো না।

বিজয়ার মনে ভীষণ ব্যথা জাগলো, বিশেষ করে বনহুরকে বন্ধন অবস্থায় দেখতে মন তার চায় না। বনহুরকে সে নিজ হাতে তুলে খাওয়ায়, নিজের হাতে ওর চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে দেয়, বনহুর যখন ঘুমায় তখন ওর মাথাটা বিজয়া তুলে নেয় নিজের কোলে।

এক বন্দীশালায় ওরা দু'জনা।

বনহুর সব সময় নিজেকে কঠিনভাবে সংযত করে রাখে। বিজয়ার প্রেম-ভালবাসা তাকে আকৃষ্ট করলেও সে মনকে শক্ত করে ফিরিয়ে রাখে বিপরীত মুখে। বনহুর বুঝে, বিজয়া তাকে পাবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু সে চায় না একটা নারীর জীবন বিনষ্ট করতে।

বিজয়া অবলা অবুঝ নারী, ওর জন্য মায়া হয় কিন্তু কি করবে, সে পারে না ওকে সান্ত্বনা দিতে। তবু সে বিজয়ার কাজে বাধা দেয় না! বিজয়া ওর মুখে খাবার তুলে দিয়ে আনন্দ পায়, ওর চুলে হাত বুলিয়ে খুশি হয়, ওর

মাথাটা কোলে রেখে তৃপ্তি লাভ করে—এসবে বনহুর নিজকে ছেড়ে দিয়েছে বিজয়ার হাতে।

একদিন বনহুর কাঠের খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে ঘুমাচ্ছিলো। হঠাৎ বুকে কারো নিশ্বাস অনুভব করলো সে, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো বিজয়া তার বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বনহুর বিজয়াকে না জাগিয়ে নিশ্চুপ রইলো, একটা অনুভূতি তার ধমনীর রক্তকে উষ্ণ করে তুললো। হাত দু'খানা তুলে বিজয়াকে গভীর আবেগে আকর্ষণ করতে গেলো, কিন্তু হাত দু'খানা তার মুক্ত না থাকায় ব্যর্থ হলো সে। বনহুর তখনই বুঝতে পারলো তার হাত দু'খানা বন্ধন অবস্থায় থাকায় খোদার ইংগিত ছিলো নইলে সে হয়তো নিজকে সংযত রাখতে পারতো না।

পরদিন হিন্দরাণী এসে দাঁড়ালো বন্দীশালার পাশে। তার পাশে কয়েকজন অদ্ভুত ধরনের মানুষ। এরা আকারে অত্যন্ত বেঁটে, কিন্তু ভীষণ মোটা ও বলিষ্ঠ। এক একজন যেন এক একটা ক্ষুদ্র গরিলা।

বিজয়া শিউরে উঠলো, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

বনহুর বুঝতে পারলো, এরা এবার তাদের বিচারে এসেছে। প্রস্তুত হয়ে নিলো বনহুর কঠিন কোনো অবস্থার জন্য। বিজয়ার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার অবস্থা অনুভব করলো। দুঃখ হলো ওর জন্য, কারণ বিজয়া রাজকুমারী, সে কোনোদিন এমন অবস্থায় পড়েনি, এমন কষ্টও সে কোনোদিন পায়নি। বনহুর বিজয়ার চোখে চোখ রেখে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো।

ততোক্ষণে কয়েকজন বেঁটে লোক বন্দীখানার ভিতরে প্রবেশ করলো, হিন্দরাণীর নির্দেশে বনহুরকে তারা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

বিজয়া আর্তনাদ করে উঠলো—তিলক!

বনহুর বললো—বিজয়া, আমার জন্য ভেবো না......

বিজয়া তবু আর্তনাদ করে চললো—তিলক......তিলক, আমি একা কি করে থাকবো, তিলক......

বনহুরকে বন্দীশালা থেকে বের করে ওরা একটা গাছের নিচে নিয়ে এলো, তারপর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলো মজবুত করে।

বনহুরের হাত দু'খানা বাঁধা থাকায় এবং মাজায় লৌহশিকল আবদ্ধ থাকায় সে ওদের কোনোরকম বাধা দিতে পারলো না। ওরা কঠিনভাবে বনহুরকে বেঁধে ফেললো গাছটির সঙ্গে। বিজয়া তখন বন্দীশালায় মাথা ঠুকে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

বিজয়ার হাত-পা মুক্ত করেই সে ফাঁক খুঁজতে লাগলো কি করে বন্দীশালা থেকে পালানো যায়।

কাঠের ফাঁকগুলো সে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো কোনোক্রমে বের হওয়া যায় কিনা। বের হতে পারলে সে চেষ্টা নেবে তিলককে রক্ষা করতে পারে কিনা।

এখানে বিজয়া যখন কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে পালানোর পথ খুঁজছে তখন বনহুরকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে তাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা চলছে।

হিন্দরাণী একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক চোখেই তীব্র প্রতিহিংসার বহ্নিশিখা যেন জ্বলছে।

তিনজন ক্ষুদ্রাকার বেঁটে মানুষ তীর হাতে দূরে একটু উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। হিন্দরাণীর নির্দেশ পেলেই তারা তীর নিক্ষেপ করবে।

সব প্রস্তুত।

হিন্দরাণী বললো—দেখো বিদেশী, তোমার দুঃসাহসের জন্য তোমাকে হত্যা করা হচ্ছে! তুমি আমার চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছিলে।

হঠাৎ বিজয়া ছুটে আসে, বনহুরকে পিছনে রেখে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠে—ওর কোনো দোষ নেই! ওকে আমি জোর করে তোমার জাহাজে নিয়ে গিয়েছিলাম। হত্যা করতে হয় আমাকে করো!

এমন সময় একজন পুরুষ এগিয়ে এলো, সে হিন্দরাণীর মত স্পষ্ট বাংলায় বললো—ওকে হত্যা করো না, ওর স্বামীকে হত্যা করো। আমি ওকে বিয়ে করবো হিন্দরাণী!

হিন্দরাণী বললো—বেশ, গুরুদেবের আশাই পূর্ণ হোক। ওকে সরিয়ে নাও।

বনহুর অধর দংশন করলো।

বিজয়া বললো—না, ওকে হত্যা করতে পারবে না তোমরা।

বিজয়ার কথা অন্য কেউ হয়তো বুঝতে পারলো না। শুধুমাত্র বুঝলো হিন্দরাণী, তার গুরুদেব ও আর দু'চারজন।

এরা সবাই বাংলা ভাষা বুঝে না এবং বলতেও পারে না।

বনহুর এবং বিজয়া প্রথম দিনই জাহাজে হিন্দরাণীর বিকৃত চেহারা ও তার হাবভাব দেখে ভেবেছিলো এ বাংলা জানে না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তার সে ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

আজও বনহুর আর বিজয়া অবাক না হয়ে পারেনি কারণ এরা কি করে বাংলা শিখলো! এদের ভাষা খাটি হিন্দ-ভাষা, কতকটা জংলীদের মত বিদঘুটে ধরনের।

বিজয়ার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো হিন্দরাণী ও তাদের গুরুদেব।

গুরুদেবের চেহারা বড় কুৎসিত কদাকার। ছোটখাটো গরিলা বলা চলে। মাথাটা সম্পূর্ণ নেড়ে, মস্তবড় পেঁপের মতো দেহের উপর একটা খুঁদে হাঁড়ির মতো মাথাটা খাড়া রয়েছে। ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো চোখ যেন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছে।

বিজয়ার কথায় গুরুদেব বলে উঠলো—বেশ, ওকে হত্যা করা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে যদি মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়।

বিজয়া উপায়হীনভাবে বলে উঠলো—হাঁ, আমি রাজি আছি।

হিন্দরাণী হাত তুলে তীরধারীদের লক্ষ্য করে একটা অদ্ভুত উক্তি উচ্চারণ করলো, সঙ্গে সঙ্গে নেমে দাঁড়ালো তীরধারী লোকগুলো।

বনহুর বললো—বিজয়া, তুমি একি করলে!

তিলক, তোমার মৃত্যুর চেয়ে ওকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে শ্রেয়। তিলক......ছুটে গিয়ে বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বিজয়া।

বনহুরের হাত-পা বাঁধা, কাজেই সে নীরব থাকা ছাড়া আর কোনো কিছুই করতে পারে না। বিজয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলে।

হিন্দরাণীর আদেশে বনহুরকে গাছের গুঁড়ি থেকে মুক্ত করা হলো, কিন্তু হিন্দরাণী অত্যন্ত চালাক নারী, সে তার হাত এবং মাজার বন্ধন মুক্ত করে দেবার আদেশ দিলো না।

বনহুরকে পুনরায় সেই কাঠের বন্দীশালায় বন্দী করে রাখা হলো।

কিন্তু বিজয়াকে সেখানে আসতে দেওয়া হলো না। তাকে বাইরে একটা কুটিরের মধ্যে আটকে রাখলো।

বিজয়া কুটিরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো। এতোদিন তার বন্দী অবস্থা কষ্টকর হলেও তিলকের সান্নিধ্য তার সব ব্যথা, সব কষ্টকে মুছে দিয়েছিলো, ভুলে ছিলো বিজয়া সব কিছু। এমন কি পিতামাতার স্নেহও তাকে আকর্ষণ করেনি। বিজয়া বনহুরের পাশে যাবার জন্য বন্দী হরিণীর মতো অস্থির হয়ে উঠলো। কুটিরের মধ্যে বসে ভাবতে লাগলো তিলকের কথা। তার হাত দু'খানা বাঁধা আছে—নিশ্চয়ই সে খেতে পারছে না, কতো কষ্ট হচ্ছে তার!

বিজয়ার চিন্তা বৃথা নয়, বনহুরকে ওরা যা খেতে দিয়েছে অমনি পড়ে আছে সেগুলো। সিদ্ধ জিনিসগুলো অখাদ্য বলা চলে, ওগুলো বনহুর বা বিজয়া মুখে দিতে পারে না। ফলমূল যা তাই ওরা খায়।

যে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য কান্দাই পুলিশবাহিনী হিমসিম খেয়ে গেছে, যাকে পাকড়াও করার জন্য বিশ্ব পুলিশবাহিনী হন্তদন্ত হয়ে পড়েছে, যাকে বন্দী কারার জন্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা মিঃ লাউলং বিফল হয়েছেন,

যাকে ধরবার জন্য মিঃ জাফরী হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, যার গ্রেপ্তারের জন্য কান্দাই পুলিশ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে, সেই দস্যু বনহুর আজ এক জংলী রাণীর হস্তে বন্দী। নিরীহ বেচারী মতো শান্ত লাগছে বনহুরকে।

❑

একদিন দু'দিন করে কয়েকটা দিন কেটে যায়।

বিজয়া কোনো ফাঁক খোঁজে কেমন করে বের হবে সে, যাবে সে বনহুরের পাশে।

সুযোগ এলো।

বিজয়াকে যখন খাবার দেয়ার জন্য একটি জংলী মেয়ে সেই কুটিরে প্রবেশ করেছে তখন বিজয়া একটা লাঠি দিয়ে তার মাথায় ভীষণ জোরে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় সেই জংলী মেয়েটি।

বিজয়া সেই ফাঁকে বেরিয়ে যায় কুটিরের মধ্য হতে, ছুটতে থাকে সেই কাঠের তৈরি বন্দীশালার দিকে। অল্পক্ষণেই বন্দীশালায় প্রবেশ করে বিজয়া। সে জানতো, কাঠের বেড়ার এক স্থানে ফাঁক আছে যে ফাঁকে সে একদিন বের হয়েছিলো।

বিজয়া বন্দীশালায় প্রবেশ করে ছুটে যায় বনহুরের পাশে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে—তিলক!

বনহুর বসেছিলো, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে উঠে দাঁড়ায়।

বিজয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে—তিলক, আমি এসেছি!

বনহুর ভুলে যায় বিজয়া তার কেউ নয়, ভুলে যায় বিজয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। গভীর আবেগে বনহুর বিজয়াকে আলিঙ্গন করতে যায় কিন্তু হাত দু'খানা বন্ধন অবস্থায় থাকায় সে ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিতে পারলো না।

বিজয়া খাবারগুলো হাতে তুলে নিয়ে বনহুরের মুখে তুলে দিতে থাকে—তিলক, কতো কষ্ট হচ্ছে তোমার?

খেতে খেতে বলে বনহুর—আমার চেয়ে বেশি কষ্ট তোমার হচ্ছে বিজয়া।

না, তুমি বেশি কষ্ট পাচ্ছো। বিজয়া বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

বনহুর পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কে যেন ওর কানে কানে বলে......বনহুর, তুমি দিন দিন বিজয়ার ভালবাসায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছো........

বনহুর আপন মনেই বলে উঠে— না না, মোটেই না........

বিজয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কি হলো তিলক?

না, কিছু না।

তুমি যে বললে—না না, মোটেই না?

ও কিছু না, হঠাৎ কি যেন মনে পড়েছিলো।

জানি তুমি তোমার প্রিয়া সেই নূরীর জন্য......

হাঁ বিজয়া, ওর কথা মনে হলে আমি সব কিছু বিস্মৃত হই।

বিজয়ার মুখখানা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে, সরে দাঁড়ায় বনহুরের পাশ থেকে একটু দূরে! বনহুর বিজয়ার মুখোভাব লক্ষ্য করে ব্যথা পায়। দুঃখ হয় বিজয়ার জন্য, বিজয়া তাকে কতোখানি ভালবেসে ফেলেছে, সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে।

বনহুর বসে পড়ে বলে—বসো বিজয়া।

বিজয়া বসে।

বনহুর বলে—বিজয়া তুমি রাজকুমারী হয়েও আজ আমার জন্য যা করছো সত্যি অপূর্ব। বিজয়া, তোমার ভালবাসার প্রতিদানে আমি কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে......তবু তুমি আমার জন্য এতো করছো; আমারই জন্য আজ তোমার এ অবস্থা।

বিজয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু। বিজয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায় বনহুরের মুখমণ্ডলের দিকে, কোনো কথা সে বলতে পারে না।

বনহুর বলে আবার—বিজয়া আমার মৃত্যুই কি শ্রেয় ছিলো না? বলো, তুমি কেন ঐ গুরুদেবকে বিয়ে করতে রাজি হলে?

এবার বলে বিজয়া—বিয়ে করবো কিন্তু আরও একটা শর্তে!

তার মানে?

তোমাকে যদি মুক্তি দেয় তাহলে আমি ঐ অসভ্য কুৎসিত লোকটাকে বিয়ে করবো, নচেৎ নয়।

তুমি যে কথা দিয়েছো?

আমি তা স্বীকার করি না তিলক। ওরা তোমাকে মুক্তি না দিলে আমি কিছুতেই ঐ বিদঘুটে লোকটাকে স্বামী বলে গ্রহণ করবো না।

বিজয়া! বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হিন্দরাণী ও সেই গুরুদেব এবং কয়েকজন বল্লম ও বর্শাধারী বেঁটে লোক বন্দীশালায় প্রবেশ করে।

হিন্দরাণী বলে উঠে—ঐ দেখো মেয়েটি এখানে।

গুরুদেবের কুৎসিত মুখে বিদঘুটে হাসি ফুটে উঠে। ওরা ভেবেছিলো মেয়েটি তাদের কুটির থেকে কোথাও পালিয়ে গেছে। অনেক জায়গা খোঁজা খুঁজি করে তবেই ওরা বন্দীশালায় এসেছে।

হিন্দরাণী তার অনুচরদের আদেশ দিলো মেয়েটিকে ধরে বের করে নিয়ে যেতে।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো ওরা।

বিজয়াকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

বনহুর রাগে অধর দংশন করতে লাগলো কিন্তু কোনো উপায় পেলো না বিজয়াকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতে।

বিজয়াকে ধরে নিয়ে গেলো ওরা।

বনহুরের কানে তখনও ভেসে আসছে বিজয়ার করুণ কণ্ঠস্বর......তিলক......আমাকে বাঁচাও...তিলক......তিলক...

❑ •

হঠাৎ নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো, তার কানে গেলো কারো কণ্ঠস্বর। নূরী পাশে তাকিয়ে দেখলো বিছানা শূন্য, চম্পা নেই। এবার নূরী শয্যা ত্যাগ করে বেড়ার পাশে এসে দাঁড়ালো, সে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো। তার কানে ভেসে এলো চম্পার ক্রুদ্ধ এবং উদ্বিগ্ন গলার আওয়াজ......হিন্দ রাণী হস্তে তারা বন্দী হয়েছে, বলো কি?

পুরুষ কণ্ঠ......হাঁ।

চম্পার গলা........আজ রাতেই আমি রওনা দেবো। তুমি ষ্টিমারের চালকদের প্রস্তুত হতে বলো।

পুরুষের গলার স্বর......আপনার আদেশ ঠিক মতোই পালন হবে।

যাও বিলম্ব করো না। চম্পা কথা শেষ করলো বলে মনে হলো।

নূরী তাড়াতাড়ি এসে শয্যায় শুয়ে পড়লো। সে বুঝতে পারলো, চম্পার বিশেষ কেউ হিন্দরাণী হস্তে বন্দী হয়েছে। কারণ তার কথাবার্তায় একটা দারুণ উৎকুণ্ঠার ভাব ফুটে উঠছিলো, তাছাড়া এই রাতেই সে হিন্দদ্বীপ অভিমুখে রওয়ানা দিচ্ছে। নিশ্চয়ই তার পরম আপন জন হবে। চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করলো।

চম্পা পাশের একটা খুপড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

নূরী চুপ চাপ শুয়ে সব দেখতে লাগলো।

চম্পা যখন বেরিয়ে এলো সেই খুপড়ীর মধ্য হতে তখন তাকে অদ্ভুত ড্রেসে সজ্জিত দেখলো নূরী। চম্পা তার কাছে জংলী মেয়ের ড্রেসে থাকলেও আসলে সে জংলী নয় তা বুঝতে পেরেছে সে এ ক'দিনেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে নূরী শয্যা ত্যাগ করে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

চমকে উঠলো চম্পা, সে ভেবেছিলো নূরীকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে যাবে, ফিরে এসে সব বলবে কোথায় এবং কেন গিয়েছিলো সে। নূরীকে দেখে বলে উঠলো—হঠাৎ ডাক পড়েছে তাই এক জায়গায় যাচ্ছি। তুমি দুটো দিন সাবধানে থাকবে কিন্তু।

নূরী চোখ রগড়ে বললো—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

অসম্ভব।

কেন?

নূরী আমি যেখানে যাচ্ছি সে স্থানে নিরাপদ নয়।

তবে তুমি যাচ্ছো কেন?

আমি কেন যাচ্ছি পরে বলবো।

না, তোমাকে বলতে হবে চম্পা দিদি!

সময় নেই নূরী, পরে সব জানতে পারবে।

আমি জানি, তুমি কোনো বন্দীকে উদ্ধার করতে যাচ্ছো।

হুঁ।

কিন্তু কে সে, বলতে হবে।

এখন এই মুহূর্তে সে কথা বলা সম্ভব নয় নূরী।

তোমার কোনো আত্মীয় হবে নিশ্চয়ই।

হাঁ, আমার পরম আত্মীয়, আমার পরম আপনজন কিন্তু থামলে কেন বলো চম্পা?

না, থাক আজ নয়। নূরী তুমি সাবধানে থাকবে। আমার লোকজন আছে তারা তোমাকে সব সময় দেখাশোনা করবে। আচ্ছা চলি......দোয়া করো বোন, আমি যেন তাকে উদ্ধার করতে পারি।

নূরী দেখলো চম্পার চোখ দুটো অশ্রুছলছল হয়ে এসেছে, গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছে। বললো নূরী—খোদা তোমাকে জয়ী করুন।

চম্পা ততক্ষণে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে।

নূরী আর তাকে দেখতে পায় না।

ফিরে আসে নূরী তার কুটিরের মধ্যে, আজ সে নিজকে বড় একা অসহায় মনে করে। চম্পা তাকে ধোঁকা দিচ্ছে না তো! সে বলেছে তার হুরকে খুঁজে এনে দেবে—কই, কতোদিন চলে গেলো কোথায় তার হুর। সে যে ওর জন্য পাগল হয়ে যাবে। আর কতোদিন সে চম্পার কথায় ভরসা নিয়ে থাকবে। জাভেদ শিশু, তাকে ছেড়ে কতোদিন কেটে গেলো; না জানি সে কেমন আছে। নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।

নূরী যখন নির্জন কুটির মধ্যে নানারকম ভাবনার জাল বুনে চলেছে তখন চম্পা তার অশ্ব নিয়ে ষ্টিমারের দিকে ছুটে চলেছে।

অদূরে নীলনদের একটি শাখা।
এখানে অপেক্ষা করছে চম্পার ষ্টিমার।
ষ্টিমারে বেশি নয় মাত্র কয়েকজন খালাসি এবং চালক মাত্র। একজন ক্যাপ্টেন বা নেতা ধরনের লোক আছে, তার নাম হুসাইন।
চম্পার অশ্বের পদশব্দ শুনে হুসাইন ষ্টিমার থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দিলো নিচে এবং আলো ফেললো সিঁড়ির মুখে।
চম্পা অশ্ব ত্যাগ করে ষ্টিমারের পাশে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আলোর ছটা ইংগিৎপূর্ণ ভাবে একবার চম্পার চার পাশে চক্রাকারে ঘুরে নিলো।
চম্পা বুঝতে পারলো সব প্রস্তুত আছে। সে এবার সিঁড়ি বেয়ে ষ্টিমারে উঠে গেলো।
চম্পার সঙ্গে আরও দু'জন জংলী লোক এসেছিলো, তারাও অশ্ব ত্যাগ করে ষ্টিমারে উঠে পড়েলো।
চম্পা বললো—হুসাইন, সব ঠিক আছেতো?
আছে। এবার ষ্টিমার ছাড়ার নির্দেশ দেবো?
হাঁ দাও। স্পীডে ষ্টিমার চালাতে বলো।
ষ্টীমার অন্ধকারে নীলনদের বুক চিরে তীরবেগে অগ্রসর হলো।
চম্পা ডেকে রেলিংএ ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আঙ্গুলের ফাঁকে তার ধূমায়িত সিগারেট। দৃষ্টি তার সম্মুখে সীমাবদ্ধ। শরীরে তার তীরন্দাজের পোশাক। চম্পাকে বড় সুন্দর লাগছে। মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুল বাতাসে উড়ছে। একটা হিমেল হাওয়া বইছে। ভোর হবার এখনো অনেক দেরী।
মাঝে মাঝে চম্পা সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করছিলো।
এমন সময় অন্ধকারে পাশে এসে দাঁড়ায় হুসাইন।
চম্পা বলে—কে?
আমি!
হুসাইন?
হাঁ।
তুমি এখানে কেন?
একটু হাসে হুসাইন।
চম্পা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ হুসাইনের হাসিটা তার কাছে কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়।
হুসাইন তার প্রধান অনুচর হিসাবেই তার পাশে স্থান পেয়েছে। বয়স ওর খুব বেশি নয়—যুবক মাত্র। তবে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং শক্তিশালী, সেই জন্যই সে তাকে নিজের অনুচরদের প্রধান হিসাবে স্থান দিয়েছে। হুসাইনকে

বিশ্বাসী বলেও জানতো সে। আজ হুসাইনকে হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে এবং অদ্ভুতভাবে হাসতে দেখে চম্পা অবাক না হয়ে পারলো না। বললো চম্পা—নতুন কোনো সংবাদ আছে?

হুসাইন শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আছে।

বলো? চম্পা সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নীলনদের হিমেল হাওয়ায় তার শরীরটা ঠান্ডা হয়ে উঠেছে। যদিও অন্ধকারে হুসাইনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবু চম্পা তীক্ষ্ম দৃষ্টি হুসাইনের মুখখানাকে দেখার চেষ্টা করলো।

হুসাইন বললো—আর কতোদিন তুমি আলেয়ার আলোর পিছনে ছুটবে রাণী?

চম্পার শরীরে কেউ যেন কশাঘাত করলো। বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে দাঁড়ালো চম্পা, কঠিন কণ্ঠে বললো—তুমি কি বলছো হুসাইন?

ও, রাণী তাহলে বুঝতে পারেননি?

আমি তোমার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না।

আমি বলছি অযথা একজনের পিছনে ধাওয়া করে কোনো...

তার মানে?

মানে সবইতো জানো রাণী।

হুসাইন!

আমি আপনার অনুচর বলে কিন্তু......

বলো থামলে কেন?

হুসাইন চম্পাকে কথার মাঝে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি, বলে সম্বোধন করে চলেছিলো। রাগে চম্পার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে। হুসাইনের এতো সাহস সে তার কাছে এসে তার কাজে প্রতিবাদ জানায়। দাঁতে দাঁত পিষে চম্পা।

হুসাইন বলে—যাকে কোনোদিন পাবে না, কেন তার পিছনে এতো কষ্ট করছো বলোতো? ওকে মরতে দাও।

হুসাইন, মুখ সংযত করে কথা বলো।

ও মরলে তুমি শান্তি পাবে রাণী।

ও মরবার আগে তোমাকে মরতে হবে......

রাণী মিছেমিছি এতো করছো। যে তোমাকে ভালবাসে তাকে তুমি কেন অবহেলা কর? আর যে তোমাকে ভালবাসে না, যে তোমার আসল পরিচয় জানে না—জানে না তুমি কে। দেখেনি আর দেখলেও তোমাকে সে চেনে না, তুমি তার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত—কেন-কেন তুমি নিজকে তার জন্য বিপন্ন করছো রাণী......

খিল খিল করে হেসে উঠে চম্পা, তারপর দাঁত পিষে বলে—হুসাইন, তুমি একজন নরাধম! নাহলে তুমি আমার সঙ্গে এসব নিয়ে আলাপ করতে আসতে না। তবে তোমার যখন এতো বাসনা তখন বলো আর কি বলবার আছে তোমার?

রাণী, তুমি যা খুশি তাই বলো। আমি নরাধম, নরপিশাচ যা খুশি বলো। তবু আমি তোমাকে বলবো, আজ বলবো সব কথা। রাণী, আমি তোমাকে ভালবাসি......

বলো আর কি বলবার আছে তোমার?

ওকে ভুলে যাও, এসো আমরা দু'জনা এক হয়ে যাই।

চমৎকার!

রাণী যেদিন আমি তোমার প্রধান অনুচর হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, সেদিন আমার মনে তোমার ছবি গভীরভাবে দাগ কেটেছে।

সুন্দর কথা!

তুমি আমাকে......

হুসাইন, সাবধানে কথা বলো, জানো আমি কে?

জানি! আর জানি বলেই আমি তোমার বিনা অনুমতিতে আজো তোমায় স্পর্শ করিনি।

কি বললে হুসাইন?

তোমাকে ভালবাসি তবু শ্রদ্ধা করি, নইলে তুমি নারী—এই গভীর রাতে নির্জন ডেকে তুমি আমার কবল থেকে রেহাই পেতে না রাণী......

বটে? এতো বড় স্পর্ধা তোমার মনে বাসা বেঁধে আছে। হাঃ হাঃ হাঃ......হাঃ হাঃ হাঃ......হঠাৎ চম্পার হাতখানা তার প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলীর আওয়াজ হয়।

ডেকের উপর লুটিয়ে পড়ে হুসাইনের রক্তাক্ত দেহ।

তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে ছুটে আসে অন্যান্য অনুচরগণ।

তারা ডেকে এসে দাঁড়াতেই চম্পা আঙ্গুল দিয়ে হুসাইনের রক্তাক্ত দেহ দেখিয়ে বললো—ওকে নীলনদে ফেলে দাও!

অনুচরগণ কেউ কোনো কথা বলার সাহসী হলো না। তারা একটু টু শব্দ পর্যন্ত করলো না।

হুসাইনের দেহটা তখন নীরব হয়ে গেছে।

লোকগুলো এবার হুসাইনের প্রাণহীন দেহটা তুলে নিয়ে নীলনদের জলে নিক্ষেপ করলো।

রাতের অন্ধকারে তলিয়ে গেলো হুসাইনের দেহটা অতল গহ্বরে।

❑

বিজয়াকে নব বধূবেশে সজ্জিত করে সাজিয়ে একটা উঁচু মঞ্চের উপর বসানো হয়েছে। ফুল আর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে তার সমস্ত দেহটা। মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা।

পাশে বরের বেশে টোপর মাথায় হিন্দ গুরুদেব। তার শরীরেও ফুলের পোশাক তবু তাকে বড় বিদঘুটে লাগছে। বিপুল দেহের উপর বেলের মত ছোট একটা মাথা। ক্ষুদে চোখ দুটো দিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে সে বিজয়ার মুখের দিকে।

সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

অগ্নি এবং শীলা সাক্ষী করে বিয়ে হবে তাদের।

বিজয়া কেঁদে কেঁদে রাঙা হয়ে উঠেছে।

আজ ক'দিন সে কিছু মুখে দেয়নি। যেদিন তাকে বনহুরের পাশ থেকে জোর করে ধরে এনে কুঠির মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলো। অবিরত শুধু কেঁদেছে বিজয়া তবু হিন্দরাণীর মায়া হয়নি।

মঞ্চের চারপাশে অদ্ভুত ধরনের বাজনা বেজে চলেছে।

ঢোল-সানাই সব আছে তার মধ্যে।

কতকগুলো অসভ্য নারী ধেই ধেই করে নেচে চলেছে। তাদের নাচ দেখলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সে-কি ভীষণ বিদঘুটে এক একজনের চেহারা। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, নিচের ঠোঁটগুলো থালার মত ঝুলে নেমেছে গলার নিচে। কারো কারো ঠোঁটে সবেমাত্র ছিদ্র করা হয়েছে। ঠোঁটগুলো যেন এক একটা কলার মত ফুটে উঠেছে। এতো যন্ত্রণা সহ্য করেও ওরা নেচে যাচ্ছে।

সে-কি এক মহা উৎসব শুরু হয়েছে।

ঢাক-ঢোল আর সানাই বাজনার শব্দ আর জংলী অসভ্য নারীদের বিদঘুটে চিৎকার সমস্ত বনভূমি প্রকম্পিত করে তুলেছে।

পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে চলেছে।

ওদিকে তখন বনহুর কাঠের বন্দীশালায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। বারবার সে অধর দংশন করছে, আর কিছু বিলম্ব হলেই বিজয়ার বিয়ে হয়ে যাবে সেই ভয়ঙ্কর জংলী গুরুদেবটার সঙ্গে। বিজয়ার জীবনটা বিনষ্ট হয়ে যাবে। না না, তা হয় না, বিজয়ার জীবন এভাবে নষ্ট হতে দেবে না সে। বনহুর হাতের লৌহশিকলে কাঠের গুড়ির সঙ্গে ভীষণভাবে আঘাত করে। হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তবু লৌহ শিকল মুক্ত হয় না।

ওদিকে তার কানে ভেসে আসছে সানাইয়ের করুণ সুর।

বিজয়ার কান্নার মতোই শোনাচ্ছে সে সুর বনহুরের কানে।

রাত গভীর।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

দূরে মঞ্চের চারপাশে দপ্‌ দপ্‌ করে মশাল জ্বলছে।

হঠাৎ কেমন যেন এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করলো। বনহুর তাকালো আকাশের দিকে। ঘন বনের ফাঁকে আকাশ যতটুকু দেখা গেলো জমাট মেঘে ভরে উঠেছে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

ওদিকে ঢাকের আওয়াজ আরো জোরে জোরে বেজে চলেছে।

মাঝে মাঝে পুরোহিতের কণ্ঠের অদ্ভুত শব্দ ভেবে আসছে। বনহুরের অস্থিরতা বাড়ছে ক্রমান্বয়ে। সে বারবার হাতের বন্ধন মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঝড়ো হাওয়ার বেগ বেড়ে এলো।

গাছপালা দুলতে শুরু করেছে।

মশালের আলো বন্দীশালা অবধি এসে না পৌঁছলেও বনহুর মশালের আলোর তীব্রছটা বেশ দেখতে পাচ্ছিলো। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিলো সেইদিকে, কারণ ওখানেই সেই বিবাহ মঞ্চ। যেখানে বসে আছে বিজয়া বধূ বেশে আর সেই পুরোহিত ঠাকুর।

বনহুর বারবার চেষ্টা করেও লৌহবন্ধন মুক্ত করতে পারছে না, সে এবার প্রাণপনে হাত দু'খানাকে টেনে শিকল ছিঁড়তে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে নারী কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলো বনহুর। কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বললো—এসো তোমার হাতের বন্ধন আমি মুক্ত করে দেই।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, শুধু একটা ছায়ার মতো কারো অস্তিত্ব অনুভব করলো, হাত দু'খানা নিচু করলো সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো।

নারীমূর্তি এক ঝোপা চাবি নিয়ে পরীক্ষা করে চললো। দ্রুতহস্তে কাজ করে চলেছে সে, যদিও চোখে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছিলো না তবু তার চেষ্টা অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে চলছে।

বনহুরের মনে বিস্ময়—কে এই নারী! এ বিজয়া নয়, বিজয়ার কণ্ঠ তার অতি পরিচিত। হিন্দরাণীর গলার স্বরও নয় এটা। এই অজানা-অচেনা দ্বীপে

হিন্দরাণীর বন্দীশালায় কে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে। বনহুর যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। নারীটি তার হাতের হাতকড়া একটির পর একটি চাবি নিয়ে খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঝড়ের দাপট তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তীব্রভাবে।

বিদুতের আলোতে বনহুর তাকায় তার পাশে দণ্ডায়মান নারীমূর্তির দিকে, মাত্র ক্ষণিকের জন্য দেখতে পায় কালো আবরণে ঢাকা একখানা মুখ, পিঠে তার তীর-ধনু বাঁধা, এটাও নজরে পড়ে বনহুরের।

অল্পক্ষণে বনহুরের হাতের লৌহশিকলের তালা খুলে যায়।

বনহুর হাত দু'খানা অন্ধকারে উঁচু করে ধরে, এখন সে মুক্ত। মাজার বন্ধন নিজেই সে খুলে ফেলে কৌশলে। কিন্তু ফিরে তাকাতেই অবাক হয়, কেউ নেই তার পাশে।

বনহুর হঠাৎ শুনতে পায় আবার সেই কণ্ঠস্বর— আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না। বনের দক্ষিণে নীলনদে একটি ষ্টিমার অপেক্ষা করছে।

বনহুর বলে উঠে– কে তুমি'? চলে গেলে কেন'?

ঝড়ো-হাওয়ায় ভেসে এলো অস্পষ্ট একটা শব্দ— আমার নাম আশা....

বনহুর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এলো কাঠের বেড়ার পাশে, অস্ফূট কণ্ঠে বললো— আশা! কে, কে তুমি আশা ......বনহুরের এখন এ নিয়ে ভাববার সময় নেই তার হাত দু'খানা মুক্ত, সে অল্পক্ষণেই বেরিয়ে এলো কাঠের বন্দীশালা হতে।

বিজয়ার হাতখানা এবার পুরোহিত গুরুদেবের হাতে অর্পণ করে বিয়ে মন্ত্র পাঠ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক এক ঘুষিতে এক একজন অসভ্য জংলীকে ধরাশায়ী করে পুরোহিতকে টেনে মঞ্চ থেকে ফেলে দিলো দূরে। গুরুদেব বিজয়ার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলো, বনহুর প্রচণ্ড এক লাথি মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দিলো নিচে।

হিন্দরাণী উচ্চ আসনে বসেছিলো, সে তার অনুচরদের আদেশ দিলো— একে পাকড়াও করে ফেলো, ওকে পাকড়াও করো।

সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বেঁটে বর্শা আর বল্লম নিয়ে ছুটে এলো।

বনহুর বিজয়ার একখানা হাত হাতের মুঠায় চেপে ধরে আর এক হাতে একটি বর্শা নিয়ে সম্মুখস্থ অসভ্য জংলীদের বাধা দিয়ে চলো। বনহুর অল্পক্ষণেই ওদের পরাজিত করে বিজয়কে নিয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলো বনের দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য করে।

ঝড়ের তাণ্ডব তখন আরো বেড়ে গেছে।

বনহুর আর বিজয়া ছুটছে।

বিজয়া হাঁপাচ্ছে রীতিমতো, কারণ সে ক'দিন প্রায় না খেয়ে আছে। পা দু'খানা চলছে না তার কিছুতেই।

বনহুর তবু ওকে টেনে নিয়ে চলেছে।

পিছনে অসংখ্য জংলীদের ক্রুদ্ধ চিৎকার। ঝড়ো-হাওয়া এবং অন্ধকারে মশালের আলোগুলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে, মনে হচ্ছে, আলোগুলো যেন আপনি ছুটে আসছে এদিকে।

বনহুর বললো— বিজয়া, যেমন করে হোক বন পেরিয়ে নীলনদের ধারে আমাদের পৌঁছতেই হবে।

আমি যে আর পারছি না তিলক!

কিন্তু কোনো উপায় নেই। পারতেই হবে তোমাকে। আমার হাত ধরে প্রাণপণে দৌড়াও বিজয়া।

বিজয়া হাঁপাচ্ছে তবু সে দৌড়াচ্ছে জীবন পণ করে।

বিজয়া দৌড়াচ্ছে আর ভাবছে তিলকের অসীম বীরত্বের কথা। আজ সে স্বচক্ষে দেখেছে তিলকের অদ্ভুত তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি। কোনোদিন সে এ দৃশ্য ভুলবে না। তিলক মানুষ না দেবতা ভেবে পায় না বিজয়া।

এক সময় বনহুর আর বিজয়া বন পেরিয়ে বেরিয়ে আসে। সম্মুখে তাকাতেই নজরে পড়ে নীলনদ। জলের উচ্ছ্বাসিত কল কল শব্দ কানে এলো তাদের।

বনহুর বললো—বিজয়া, আমরা বেঁচে গেছি, আর ওরা আমাদের ধরতে পারবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকালো। ঝড়ো-হাওয়া এখন অনেকটা কমে এসেছে। বনহুর আর বিজয়া বিদ্যুতের আলোতে দেখলো নীলনদের অদূরে একটা ষ্টিমার দাঁড়িয়ে।

বনহুর বললো—শীঘ্র ঐ ষ্টিমারে চলো।

বিজয়া বনহুরের হাত ধরে ছুটে চললো ষ্টিমারের দিকে।

অদ্ভুত যোগাযোগ।

ষ্টিমারের সিঁড়ি নামানোই ছিলো।

বনহুর বিজয়াকে হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত তুলে নিয়ে এলো ষ্টিমারে।

ততোক্ষণে হিন্দদ্বীপের অধিবাসীরা বর্শা আর বল্লম হাতে বন থেকে বেরিয়ে এসেছে। অনেকের হাতে বর্শা এবং জ্বলন্ত মশাল।

বনহুর আর বিজয়া তখন ষ্টিমারের ডেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আশ্চর্য হলো বনহুর, তারা ষ্টিমারে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিমার তীর ছেড়ে চলতে শুরু করলো। এতোক্ষণ ষ্টিমারখানা যেন তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলো।

ওরা যখন নীলনদের তীরে এসে দাঁড়ালো তখন ষ্টিমারখানা নীলনদের ভিতরে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

ষ্টিমার লক্ষ্য করে জংলীরা বল্লম আর বর্শা ছুড়তে লাগলো, কতকগুলো জংলী সাঁতার দিলো নীলনদে কিন্তু ষ্টিমারের গতি বেড়ে গেছে।

বনহুর আর বিজয়া যখন ষ্টিমারে এসে পৌঁছেছিলো তখন পূর্বদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। এবার বনহুর ফিরে তাকালো বিজয়ার দিকে। দেখলো বিজয়ার দেহে নববধূর অদ্ভুত ড্রেস। ললাটে সিঁদুরের রেখা আঁকা, গলার এবং খোঁপায় তখনো ফুলের মালা দুলছে, হাঁপাচ্ছে বিজয়া।

বনহুর বললো—মস্তবড় একটা বিপদ কেটে গেলো।

সরে এলো বিজয়া—হাঁ, ওরা যদি এবার আমাদের ধরতে পারতো তাহলে আর রক্ষা ছিলো না। তিলক, তোমাকেও ওরা হত্যা করতো......

আর তোমাকে বিয়ে করে ফেলতো ঐ গুরুদেবটি।

সত্যি, ভাবতে আমার বুকটা এখনও কাঁপছে। ভাগ্যিস, তুমি ঠিক সময় আমাকে উদ্ধার করেছো তিলক, আর একটু হলে ওর সঙ্গে আমার অগ্নিশীলা সাক্ষী করে বিয়ে হয়ে যেতো। জানো না তিলক, হিন্দু শাস্ত্রে কোনো মেয়ের একবার বিয়ে হলে আর কোনোদিন সে......

কেউ জানতো না বিজয়া, কাজেই তোমারও কোনো চিন্তা ছিলো না।

বিজয়া বলে উঠে—তিলক, এ ষ্টিমারখানা বুঝি......

আমিও জানি না বিজয়া এ ষ্টিমারখানা কার।

তার মানে?

এ ষ্টিমার সম্বন্ধে তুমিও যা জানো, আমিও তাই। এসো এবার দেখা যাক।

ইস্, তোমার কপালটা কেটে গেছে তিলক, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

হাতের পিঠে কপালের রক্ত মুছে বললো বনহুর—ও কিছু না. চলো দেখি এ জাহাজ কাদের। আবার নতুন কোনো......

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একজন খালাসি এসে দাঁড়ায়, বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—আসুন আপনারা।

বনহুর আর বিজয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

খালাসি বললো—আসুন।

এবার বনহুর পা বাড়ালো, বললো—এসো বিজয়া।

বিজয়া ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললো—আবার কোনো বিপদে পড়বো না তো?

উপায় কি আছে বলো; বিপদ এলেও তাকে সানন্দে গ্রহণ করতে হবে। এসো দেখা যাক।

বিজয়া বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে চলে।

একটা সুন্দর সুসজ্জিত ক্যাবিনে এসে দাঁড়ালো খালাসিটা।

বনহুর আর বিজয়া তাকিয়ে দেখলো ক্যাবিনটা বড় সুন্দর। চারিদিকে রুচিসম্পন্ন আসবাব থরে থরে সাজানো। সুন্দর একটি শয্যা, শয্যায় ধব্ধবে কোমল বিছানা পাতা। এক পাশে ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে প্রসাধনের সামগ্রী। এক পাশে আলনায় নানারকমের পোশাক-পরিচ্ছদ থরে থরে সাজানো।

খালাসি বললো—আপনি এ ক্যাবিনে আরাম করুন। বিজয়াকে লক্ষ্য করে বলে—আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বিজয়া ভয় বিহ্বল চোখে তাকালো বনহুরের মুখে।

বনহুর বললো—যাও বিজয়া।

আমার ভয় করছে তিলক। আমি একা কোথাও যাবো না।

তবে চলো আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

বনহুর আর বিজয়া খালাসির সঙ্গে অগ্রসর হলো।

খালাসি এবার বেশি দূর না গিয়ে পাশের ক্যাবিনের দরজা খুলে বললো—মেম সাহেব, আপনি এই ক্যাবিনে বিশ্রাম করুন।

খালাসি চলে গেলো।

বনহুর বললো—আশ্চর্য এদের বুদ্ধি-জ্ঞান বিজয়া, দেখছো তোমার জন্য এরা ভিন্ন ক্যাবিনের ব্যবস্থা করেছে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করলো বনহুর আর বিজয়া।

প্রথম ক্যাবিনের মতোই সুন্দর করে সাজানো এ ক্যাবিনটাও। সুন্দর শয্যা, ড্রেসিং টেবিল এবং নানারকম প্রসাধনী দ্রব্য সাজানো রয়েছে। মেয়েদের ব্যবহারী জামা-কাপড়ও রয়েছে এ ক্যাবিনে।

খুশি হলো বিজয়া।

বনহুর বললো—বিজয়া, তুমি এ ক্যাবিনে বিশ্রাম করো। আমি পাশের ক্যাবিনে আছি। কিন্তু বিশ্রামের পূর্বে আমি একবার এ ষ্টিমারখানা পরিদর্শন করে আসি।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

বেশ, এসো।

বনহুর আর বিজয়া ষ্টিমারখানা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। চালক এবং খালাসিগণ ছাড়া এ জাহাজে কাউকে দেখলো না তারা। বনহুর আর বিজয়া যখন জাহাজখানাকে ঘুরেফিরে দেখছিলো তখন গোপন জায়গা হতে দুটো চোখ তাদের অনুসরণ করছিলো।

বনহুরও খুঁজে ফিরছিলো অজানা-অচেনা একজনকে। কিন্তু তেমন কাউকে নজরে পড়লো না। বনহুর মনে একটা অস্বস্তি বোধ করছিলো, তার সন্ধান যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো। কই, কোথায় সেই আশা, যার কাছে সে আজ কৃতজ্ঞ।

বিজয়াকে তার ক্যাবিনে রেখে ফিরে এলো বনহুর নিজের ক্যাবিনে। বাথরুমে প্রবেশ করে মুখ-হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলো তারপর ফিরে এলো ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে ফিরে অবাক হলো বনহুর, টেবিলে তার জন্য খাবার সাজানো।

বনহুর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলো, সে দ্রুতহস্তে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো। ফলমূল প্রচুর ছিলো, কাজেই বনহুরটি তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে খেলো। কারণ ফলমূলই বনহুরের প্রিয় খাদ্য। খাওয়া শেষ হলে বনহুর শয্যায় এসে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো, কতোদিন এমন শয্যায় সে শোয়নি।

শুয়ে পড়তেই বনহুরের মনে ভেসে উঠলো সেই অদ্ভুত নারীটির কথা, সেই কণ্ঠস্বর—আমার নাম আশা......বনহুর যতো ভাবে ততোই যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। আশা......একবার নয়, বারবার সে তাকে নানাভাবে রক্ষা করে চলেছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয় বনহুর, আশা যেই হোক কিন্তু সে কি করে তার সন্ধান পেলো! কি করে জানলো বনহুর বন্দী হয়েছে হিন্দদ্বীপ রাণীর হস্তে! আর কি করেই বা সে এই ঝড়োরাতে এ দ্বীপে এসে হাজির হলো অকস্মাৎ! বনহুর যতো ভাবে ততোই যেন চঞ্চল হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই সে এই জাহাজেই আছে। কিন্তু সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে তবু তাকে পায়নি সে। ব্যাকুল আগ্রহ জাগে তার মনে, কে এই আশা তাকে এমনভাবে লক্ষ্য করে চলেছে অথচ সে তাকে চেনে

না......ভাবতে ভাবতে এক সময় তন্দ্রা নেমে আসে বনহুরের চোখে। কতোদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে, একসময় ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

ষ্টিমার চলেছে।

একটানা ঝক ঝক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পাশের ক্যাবিনে বিজয়াও নিদ্রিত। তার শরীরও অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো।

বনহুর যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন ক্যাবিনের মেঝেতে এসে দাঁড়ালো নূরীর সেই জংলী বান্ধবী চম্পা। দেহে তার তীরন্দাজের ড্রেস, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চম্পা এসে দাঁড়ালো বনহুরের শিয়রে। নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে সে বনহুরের নিদ্রিত মুখমন্ডলে তাকিয়ে রইলো। হাতখানা ওর ললাটে রাখতে গেলো কিন্তু সে নিজকে সংযত করে নিলো। কে যেন চম্পার কানে কানে বললো......না না, ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, তুমি ওকে স্পর্শ করোনা......

চম্পা হাতখানা সরিয়ে নিলো। তারপর যেমন সন্তর্পণে এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো সে ক্যাবিন থেকে।

❑

মনসুর ডাকু আজ একজন দরবেশ।

তার মুখে দাড়ি, মাথায় জটাধরা একমাথা চুল। গলায় বড় বড় তসবী। গায়ে কম্বল জড়ানো, মুখে সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম।

মনসুর ডাকু বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। আজ এ বন কাল সে বন। একদিন সে হাজির হলো ঝাম জঙ্গলে। অনেক ঘুরেফিরে হঠাৎ সে একসময় পৌঁছে গেলো রাণীদেবীর আখড়ায়।

প্রথমে মনসুর অবাক হলো, কে এই দেবী যার দয়ার সীমা নেই! প্রতিদিন শত শত দীনদুঃখী এসে হাজির হয় এই ঝামজঙ্গলে। আজ এ জঙ্গল এক তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে।

মনসুর ডাকু এখানে এসে স্তম্ভিত হয়।

মনসুর ডাকু দূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা নয়নে দেখছিলো এ দৃশ্য। একটা সুউচ্চ স্থানে দন্ডায়মান এক নারী, তার দেহে শুভ্র পোষাক, গলায় রুদ্রাক্ষের

মালা, একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের উপর। চোখে অদ্ভুত মায়াময় দৃষ্টি। তার দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে থালাভর্তি স্বর্ণমোহর। পিছনে আরো দু'জনের হাতে কাপড়, আরো দু'জনের হাতে চাউল।

দেবী দু'হাতে এগুলো গরিব-দুঃখীদের মধ্যে দান করে চলেছে। সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে গরিব অসহায় বেচারিগণ। সবার হাতে দেবী তুলে দিচ্ছে এসব জিনিস, তারা গ্রহণ করে সরে যাচ্ছে যে যার পথে।

হঠাৎ দেবীর দৃষ্টি এসে পড়ে বৃদ্ধ মনসুর ডাকুর উপর। তৎক্ষণাৎ সে তার অনুচরদের বলে—বৎস, যাও ঐ বৃদ্ধকে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো। বৃদ্ধ ভিড়ের মধ্যে আসতে পারছে না।

কথাটা শোনামাত্র সেই ব্যক্তি এগিয়ে গেলো মনসুর ডাকুর পাশে। বিনীত কণ্ঠে বললো—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন আপনাকে দেবী ডাকছেন।

মনসুর ডাকু এগিয়ে গেলো, দেবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সে।

দেবীর দিকে নির্ণিমেষ নয়নে তাকালো—শুভ্র বসন, এলো চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে চন্দনের আলপনা—অপূর্ব শ্রী, তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি; সহসা মনসুর ডাকু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না।

দেবী হেসে বলে—বাবাজী, অমন করে কি দেখছেন?

দেখছি তোমাকে। কে তুমি মা?

আমার পরিচয়......

হাঁ,. আমি জানতে চাই?

পরিচয় আমার কিছু নেই বাবাজী, আমি একজন মানুষ। নিন, আপনি নিন......দেবী দু'হাতে মোহর তুলে মনসুর ডাকুকে দিতে যায়।

মনসুর ডাকু বলে—না, ও সব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

মোহর আপনি চান না?

না।

তবে কি চান আপনি?

আমি ভিখারী নই মা, আমি তোমার মতো একজন মানুষ হতে চাই।

কে, কে আপনি?

আমার পরিচয় পরে বলবো। আমি জানতে চাই তুমি কে মা?

এমনভাবে এ স্থানে আমার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বাবাজি। আপনি আমার আশ্রমে যান এবং সেখানে বিশ্রাম করুন, আমি এসে সব বলবো।

দেবী পুনরায় দানকার্যে মনোযোগ দিলো।

অনুচরটি বললো—আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

বৃদ্ধ মনসুর এগিয়ে চললো লোকটির সঙ্গে।

অদূরে এক পর্ণকুটির।

মনসুরসহ লোকটি সেই পর্ণকুটিরের সম্মুখে এসে থামলো। বললো লোকটি—এই কুটিরে আপনি বিশ্রাম করুন বাবাজি, এটাই দেবীর কুটির।

বিস্ময়ে দু'চোখ বড় হলো মনসুরের। যে দু'হাতে স্বর্ণমোহর বিলিয়ে চলেছে সেই দেবীর এই পর্ণকুটির! আশ্চর্য নারী।

মনসুরকে রেখে চলে গেলো লোকটা।

মনসুর ডাকু তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। কিন্তু বেশিক্ষণ সে দাঁড়াতে পারলো না, পা দু'খানা যেন শিথিল হয়ে আসছে, কারণ সে সমস্ত দিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

মনসুর ডাকু এবার কুটিরের দাওয়ায় উঠে বসলো।

অল্পক্ষণেই দু'চোখ মুদে এলো তার।

কুটিরের দেয়ালে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো বৃদ্ধ মনসুর।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে, হঠাৎ কোমল কণ্ঠের আহ্বানে নিদ্রা ছুটে গেলো মনসুর ডাকুর। সোজা হয়ে বসলো সে, চোখ মেলে দেখলো, সেই দেবীমূর্তি তার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

মনসুর শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো।

দেবী বললো—আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এবার মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন।

মনসুর তার কথায় যেমন আনন্দ পেলো, তেমনি তৃপ্তি বোধ করলো সে।

দেবীর কথামতো হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলো।

এবার বসলো দেবী তার সম্মুখে—বলুন, কে আপনি?

মনসুর ডাকুর মুখ ম্লান হলো, বললো—আমার পরিচয় অতি জঘন্য, তুমি ঘৃণা করবে মা।

না, আমি কাউকে ঘৃণা করি না বাবাজি। সবাই মানুষ, এই আমি জানি।

আমি যে মানুষ নামের কলঙ্ক!

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে ত্যাগ করে বলে দেবী—মানুষ কোনোদিন কলঙ্কময় হয় না বাবাজি। তার কর্মফল তাকে একটা মায়ার জালে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই মানুষ তখন মনে করে সে মানুষ নামে কলঙ্ক।

তুমি কে আর কোথায় পেলে মা তুমি এমন জ্ঞান?

আমার পরিচয়ও অতি নিকৃষ্ট, আমিও কলঙ্কময়ী নারী......

এ তুমি কি বলছো দেবী?

হাঁ, যা বলছি সত্য।

দেবী!

দেবী নয়, নর পিশাচিনী। একদিন এই হাতে শত শত মানুষকে আমি হত্যা করেছি বাবাজি। একদিন ঐশ্বর্য আর অর্থের মোহ আমাকে উন্মাদিনী করে তুলেছিলো। হাঁ, আমি সেদিন মানুষ ছিলাম না, আমি ছিলাম এক ভয়ঙ্করী নারী......

মনসুর বিস্ময়ভরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে শুভ্র বসন দেবীমূর্তির দিকে। তার চোখেমুখে এক কঠিন রূপ ফুটে উঠেছে।

দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো বলে চলেছে সে।

মনসুর ডাকু নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তার কথাগুলো শুনে যাচ্ছে।

বলে চলেছে দেবী—অর্থের নেশা আমাকে পিশাচিনী করে তুলেছিলো সেদিন। রাজরাণী হয়েও আমি শান্তি পেতাম না। রাজসিংহাসন আমার কাছে তুচ্ছ মনে হতো। আমার নেশা ছিলো শুধু সম্পদ।

অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে মনসুর—তারপর?

আমি রাজসিংহাসন ত্যাগ করে গোপনে দস্যুতা শুরু করি। অসংখ্য হত্যালীলা করি এবং পাই অসংখ্য অর্থ আর ঐশ্বর্য। আমি মনে করি তখন, আমার মতো আর কেউ নেই যার এমন শক্তি আর সম্পদ আছে।

তারপর?

আমার কানে আসে, একজন আছে সে আমার চেয়ে আরো শতগুণ বেশি শক্তিশালী এবং সম্পদশালী। আমি হাসলাম—আমার চেয়ে কেউ বড় হতে পারে না। একদিন আমি হানা দিলাম তার একটি আস্তানায়। হত্যা করলাম তার সেই আস্তানার প্রধান অনুচরকে। লুটে নিলাম প্রচুর সম্পদ। সেদিন অভূতপূর্ব এক আনন্দে মন আমার ভরে এলো। আমি জয়ী হয়েছি, সে যতবড় শক্তিশালীই হোক তার সম্পদ আমি লুটে নিয়েছি। কিন্তু একদিন আমি যে তার কাছে পরাজিত হবো, এ কথা সেদিন ভাবিনি।

বলো? বলো দেবী তারপর?

সেই শক্তিশালী ব্যক্তি একদিন আমার রাজপ্রাজসাদে এলো ছদ্মবেশে। আমি তাকে চিনতে পারলাম না, তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেললাম......একটু থামলো দেবী, পিতার বয়সী দরবেশের সম্মুখে। হয়তো তার লজ্জা হলো।

মনসুর বললো—বলো মা, তুমি বলো, আমি সব শুনবো।

বাবাজি, আমি সেদিন জানতাম না সেই তেজোদ্দীপ্ত অপূর্ব অদ্ভুত যুবক সে-ই—যাকে পরাজিত করবার জন্য আমি পাগলিনী হয়ে উঠেছিলাম। সে আমার মনোভাব জানতো, হয়তো সে মনে মনে হাসতো আমার কার্যকলাপ দেখে! আমাকে সে অনেক সময় সাহায্য করতো যাকে আমি নাকানি-চুবানি খাওয়াতে চাই তার সন্ধানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলাম আমি শুধু তার কাছে নয়, নিজের কাছে নিজেই।

দেবী........

হাঁ, আমি পরাজিত তার কাছে, আমার নিজের কাছেও!

কিন্তু কে সে, যার কাছে তুমি হেরে গেছো দেবী?

আসুন বাবাজি আমার সঙ্গে, আমি তাকে দেখাচ্ছি......

মনসুর তাকে অনুসরণ করলো।

কুটির মধ্যে প্রবেশ করতেই একটা সুমিষ্ট গন্ধ তাকে অভিভূত করে ফেললো। চারিদিকে ধূম্ররাশি ছড়িয়ে আছে। কেমন যেন দেব মন্দিরের মতো মনে হলো মনসুরের কাছে।

দেবী একটি মোম জ্বালালো।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলো মনসুর। ধূম্ররাশি ভেদ করে একটা ছবি ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে। মনসুর এগিয়ে গেলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে। চিত্রার্পিতের মতো তাকিয়ে আছে সে ছবিখানার দিকে।

দেবী বললো—এই সেই মহান ব্যক্তি যার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি বাবাজি......

আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠে মনসুর ডাকু—এ যে দস্যু বনহুর!

আপনি........আপনি তাকে চেনেন? তাকে দেখেছেন আপনি?

হাঁ দেবী, আমিও যে তার কাছে পরাজিত মা।

বাবাজি আপনি কে, কে আপনি? কি আপনার পরিচয়?

আমি মনসুর ডাকু!

মনসুর ডাকু!

হাঁ মা, আমিও একজন মহাপাপী, দস্যু বনহুরের পিতা কালু খাঁ আমার যেমন বন্ধু ছিলো তেমনি শত্রুও ছিলো। কালু খাঁ আমাকে একবার চরমভাবে অপদস্থ করেছিলো। তার কাছে আমি অপমানিত হই। কিন্তু

তাকে আমি পারি না জব্দ করতে। পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি দস্যু বনহুরের প্রতি কঠিন আকার ধারণ করি। তাকে হত্যা করার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠি।

বলুন তারপর?

কৌশলে তাকে বন্দী করতে গিয়ে তার হাতে বন্দী হই। কিন্তু বনহুর আমাকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পেয়ে আমি আবার ক্ষেপে উঠি ভীষণভাবে, আবার তাকে বন্দী কারার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাই। আবার আমি বন্দী হই বনহুরের ভূগর্ভ বন্দীশালায়। সেবারও বনহুর আমাকে ক্ষমা করে কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না। একদিন তাকে বন্দী করতে সমর্থ হই।

দেবী বলে উঠে—আপনি তাকে বন্দী করতে পেরেছিলেন?

হাঁ, তাকে আমি বন্দী করি এবং আমার পাতালপুরীর গোপন বন্দীশালায় তাকে আটকে রাখি—শুধু তাই নয়, তার একমাত্র সন্তান নূরকে আমার অনুচরগণ ধরে নিয়ে আসে।

আপনি কি বলছেন দরবেশ বাবাজি?

যা সত্য আমি সব বলছি......মনসুর ডাকু সব কথা আজ বলে যায় দেবীর কাছে। আজ সে মনসুর ডাকু নয়, সে মনসুর দরবেশ বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

দেবী ও মনসুর ডাকুর বহুক্ষণ নীরবে কাটে।

বলে উঠে মনসুর—আমিও হেরে গেছি দেবী ওর কাছে......আঙ্গুল দিয়ে মনসুর দেখায় বনহুরের দীপ্তময় ছবিটা।

দেবী তখন নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটো।

মনসুর এবার বলে উঠে—তুমিই সেই রাণী দুর্গেশ্বরী! তোমায় আমি চিনতে পেরেছি দেবী, তোমায় আমি চিনতে পেরেছি........

❑

ষ্টিমারখানা নীলনদ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর ষ্টিমারের চালককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলো এই ষ্টিমারের মালিক একজন জংলী সর্দার। নাম তার ভূজঙ্গ। এরা নাকি তার আদেশেই সেদিন হিন্দদ্বীপে গিয়েছিলো এবং ঝড়ের জন্য তারা ষ্টিমার রাতে

ছাড়তে না পেরে ভোর রাতে ছেড়েছিলো। তারা এখন নীল দ্বীপের অদূরে সন্ধী দ্বীপে যাচ্ছে। চালক আরও বলেছিলো তাদের সর্দার ভূজঙ্গ বলেছে সব সময় তারা যেন অতিথিকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেখায়।

ষ্টিমার চালকের কথা শুনে হেসেছিলো বনহুর, বলেছিলো—তোমাদের সর্দারের মহত্বের পরিমাপ হয় না। সেদিন ঝড়ো হাওয়া আর দূর্যোগপূর্ণ রাতে তোমাদের সর্দারের সহানুভূতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই নাও আমার এই আংটি, এটা তাকে দিও।

হাত বাড়ালো চালক।

বনহুর তার আঙ্গুল থেকে আংটিখানা খুলে চালকের হাতে দিলো।

চালক বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে আংটিটা দেখতে লাগলো। জীবনে সে বহু আংটি দেখেছে কিন্তু এমন উজ্জ্বল দীপ্ত পাথরযুক্ত আংটি সে দেখেনি কোনোদিন।

বনহুর গোপনে অনেক সন্ধান করেছে কিন্তু পরাজিত হয়েছে সে আশার কাছে। আশা কি তবে এ জাহাজে সত্যিই নেই? হয়তো তাই হবে, না হলে সে সমস্ত জাহাজখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। তার নিপুণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে, এমন জন বুঝি এ পৃথিবীতে নেই।

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো সম্মুখে ফেনিল জলরাশির দিকে। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে। নির্বাক নয়নে সেইদিকে তাকিয়ে ছিলো বনহুর। কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। নূরীর সন্ধানে এসে একি সব আজগুবি ঘটনার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে। কোথায় নূরী যাকে সে খুঁজে ফিরছে......

তিলক!

বিজয়ার কণ্ঠস্বরে বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরে তাকায় সে পাশে।

বিজয়া বলে—সব সময় অমন করে কি ভাবো তিলক?

একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে বনহুর—যার সন্ধানে এলাম তাকে পেলাম না বিজয়া।

জানি তুমি তার জন্য অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছো।

মিথ্যা নয়।

তিলক, তোমার নূরী সত্যি ভাগ্যবতী......

তার মানে?

মানে তুমি যার জন্য ভাবছো সেকি কম? আজ এতো করেও তোমার মনে দাগ কাটতে পারলাম না তিলক! একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বিজয়া।

বনহুর বললো—তুমি তো জানো পাথরে কোনোদিন আঁচড় পড়ে না।

সত্যি তোমার হৃদয় কি পাথরের মতো শক্ত?

তার চেয়েও শক্ত।

হাঁ, তা না হলে তুমি এতো কঠিন হতে পারতে না তিলক। জানি না কেন তুমি এমন কঠিন হয়েছো।

কর্তব্য আমাকে কঠিন করে তুলেছে বিজয়া।

বিজয়া আর বনহুরে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন অদূরে তক্তার ফাঁকে দু'খানা চোখ ভেসে উঠে, মায়াভরা দুটি চোখ।

বনহুরের কথাগুলো তার কানে এসে পৌছলো, দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল। ধীরে ধীরে চোখ দুটো তার নিজের আঙ্গুলে এসে থামলো, সেই আংটিটি তার আঙ্গুলে পরা রয়েছে। যে আংটিখানা দিয়েছিলো বনহুর ষ্টিমার চালকের হাতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চম্পা, আংটিসহ হাতখানা তুলে নিজের কোমল গণ্ডে রাখলো, আপন মনেই বললো—তোমার এ দান আমার জীবনের সম্পদ বনহুর।

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে আছে বনহুর।

ক্যাবিনে ডিমলাইট জ্বলছে।

হঠাৎ আলো নিভে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের, চোখ মেলে তাকালো অন্ধকারে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ছে না—শুধু কানে ভেসে এলো একটা লঘু পদশব্দ।

বনহুর নিঃশব্দে পড়ে রইলো, নিশ্চয়ই আশার আবির্ভাব ঘটেছে। এবার সে হাতেনাতে ধরে ফেলবে ওকে। পদশব্দ ধীরে ধীরে তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে।

বনহুর এবার নিজকে প্রস্তুত করে নিলো।

শয্যা ত্যাগ করে খপ্ করে ধরে ফেললো ওর হাতখানা। বনহুর অনুভব করলো তার কঠিন হাতের মধ্যে একটা কোমল হাতের অনুভূতি। ঠিক সে এবার তাকে ধরে ফেলেছে যে এতোদিন তাকে ধোঁকা দিয়ে আত্মগোপন করে ফিরেছে। বনহুর বলে উঠে—আশা, এবার তুমি আমার কাছে

আত্মগোপন করতে পারবে না......আমি তোমায় ধরে ফেলেছি......বাম হস্তে হাতখানা চেপে ধরে ডান হাতে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—বিজয়া তুমি!

হাঁ।

এই গভীর রাতে এখানে কেন?

জানি না কে আমাকে এখানে টেনে এনেছে। জানি না তিলক! বিজয়া দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকায়।

বনহুর গম্ভীর মুখে শয্যায় ফিরে যায়।

বিজয়া দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর আর বিজয়া নীরব।

একসময় বলে উঠে বনহুর—বিজয়া, জানি তুমি আমাকে ভালবাসো এবং সেই কারণেই তুমি আমাকে ছেড়ে দূরে থাকতে চাও না। জানি তোমার ভালবাসা অতি নির্মল......ফুলের মতোই পবিত্র, কিন্তু......

বিজয়া আর দাঁড়াতে পারে না. সে ছুটে বেরিয়ে যায় ক্যাবিন থেকে। নিজের ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এমন সময় একটা তরুণ খালাসি প্রবেশ করে সেই ক্যাবিনে।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকায় বিজয়া, বিস্মিত কণ্ঠে বলে—কে?

তরুণ খালাসি মাথার পাগড়ীটা ঠিক করে নিয়ে তার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—আমি এ ষ্টিমারের একজন নগণ্য খালাসি।

তা এখানে কেন?

আপনার কান্নার শব্দ পেয়ে এলাম। কি হয়েছে আপনার বলবেন কি?

না, আমার কিছু হয়নি, তুমি যেতে পারো।

আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আপনি আমার বোনের মতো—আমার বড় বোন জ্যাকির মতো.....

এবার বিজয়া ভাল করে তাকালো ওর দিকে। দেখলো তরুণ খালাসিটি নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজয়া বললো—এই শোনো।

এগিয়ে এলো তরুণ খালাসি। আর একবার সে মাথার পাগড়ীটা ঠিক করে নিলো।

বললো বিজয়া—তোমার বোন আমার মতো বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক আপনার মতো! ক'দিন আপনাকে দেখছি, কিন্তু কাছে এগুবার সাহস পাইনি। আজ আপনার কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না। আচ্ছা দিদি, আজ আপনার স্বামী বুঝি কিছু......

চুপ করো......কে আমার স্বামী!

ঐ সাহেব!

ও আমার কেউ হয় না।

অবাক কণ্ঠে বলে খালাসি—আপনার কেউ হয় না উনি!

না।

তবে যে আপনি তাঁর জন্য......

যাও, আর কথা বাড়াতে হবে না।

আচ্ছা যাচ্ছি দিদি। পা বাড়ায় তরুণ খালাসি।

বিজয়া বলে—শোনো।

ফিরে তাকায় খালাসি।

বিজয়া বলে—তোমার নাম কি ভাই?

আমার নাম আশা। আমার বাবা-মার আমি একমাত্র সন্তান কিনা, তাই আমার উপর তাদের অনেক ভরসা, সেইজন্য আমার নাম আশা রেখেছিলো......

চমৎকার নাম তোমার, আশা। যাক তোমাকে পেয়ে আমার খুব ভাল হলো। গল্প করে সময় কাটানো যাবে। দেখি, দেখি তোমার আংগুলে ও আংটিটা, ওটা তুমি কোথায় পেলে?

হাসলো আশা, বললো—এ আংটি আপনার ঐ সাহেব এ জাহাজের মালিককে দিয়েছে।

তা তোমার আঙ্গুলে কেন?

এখন নয় পরে বলবো। আসি দিদি, কেমন?

বেরিয়ে গেলো তরুণ খালাসি।

বিজয়ার মনে সন্দেহ জাগলো, তিলকের আংটি কি করে তরুণ খালাসির আঙ্গুলে গেলো। নিশ্চয়ই সে চুরি করেছে, না হলেও সে ওটা পেলো কোথায়?

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়া ছুটে গেলো বনহুরের ক্যাবিনে।

বনহুর সবে শয্যা ত্যাগ করে উঠে বসেছে। বিজয়াকে দেখে বলে উঠে—বিজয়া, কি হলো?

তিলক, দেখি তোমার হাতখানা? বিজয়া বনহুরের হাতখানা টেনে নিলো হাতের মধ্যে, বললো—তোমার সেই হীরার আংটি কোথায়?

হেসে বললো বনহুর—আছে।

আছে! কি বলছো তুমি?

এ জাহাজের মালিককে আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমার সেই আংটিটি দিয়েছি।

মালিক!

হাঁ।

একটি তরুণ খালাসি এ জাহাজের মালিক!

তরুণ খালাসি!

হাঁ, একটি তরুণ খালাসির হাতের আঙ্গুলে আমি সেই আংটি দেখেছি।

কই, সেতো তরুণ খালাসি নয়, সে এ জাহাজের বৃদ্ধ চালক। আমি তার হাতে আংটি দিয়েছি তাকে পরবার জন্য নয়। বনহুর উঠে দাঁড়ালো—চলো তুমি কার আঙ্গুলে আংটি দেখেছো দেখাবে চলো।

বিজয়া অনেক খুঁজেও তরুণ খালাসিকে আর পেলো না।

বনহুর আর বিজয়া এসে দাঁড়ালো সেই বৃদ্ধ চালকের কাছে। বনহুর বললো—তুমি আংটিটা কি করেছো?

হেসে বললো—আছে। আমার কাছেই আছে। পৌঁছে মালিককে দেবো।

বিজয়া বললো—ও মিথ্যা কথা বলছে। কই, দেখি কোথায় সে আংটি?

বৃদ্ধ চালক তার পুঁটলি খুলে সেই আংটি বের করে বনহুর আর বিজয়ার সম্মুখে মেলে ধরলো—এই যে দেখুন।

বনহুর তাকালো বিজয়ার মুখের দিকে।

বিজয়া বললো—আশ্চর্য!

বনহুর হাসলো, সে জানে এ জাহাজেই আছে এ জাহাজের মালিক। বিজয়া তারই হাতের আঙ্গুলে আংটিখানা দেখেছিলো। সেই তরুণ খালাসিই......

বনহুর আর বিজয়া বেরিয়ে এলো বাইরে।

অল্পক্ষণেই তীর দেখা গেলো।

চালক জানালো, তারা তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে।

বিজয়ার মনে নতুন জীবন লাভের আনন্দ। বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর, কারণ সে যার সন্ধানে এসেছিলো তাকে পায়নি।

একসময় ষ্টিমারখানা দ্বীপে এসে ভিড়লো।

নেমে পড়লো বনহুর আর বিজয়া।

কিন্তু কোথায় যাবে তারা, এটা তাদের সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা দ্বীপ।

ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় একটি জংলী মেয়ে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর বিজয়ার সম্মুখে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বাম পাশে খোঁপা করে বাঁধা। একখানা ছোট্ট কাপড় হাঁটুর উপর উঁচু করে পরা। খোঁপায় চুল গোঁজা! গলায় ফুলের মালা। হাতে ফুলের বালা। কতকগুলো চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে কপালে আর কাঁধে। বনহুর আর বিজয়াকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো—এই তোরা কোথায় যাবি বাবু?

বিজয়া বললো—এখানে আমাদের কেউ নেই।

তবে যাবি আমাদের ঘর? জংলী মেয়েটি একমুখ হেসে বললো।

বনহুর বললো—যাবো! এসো বিজয়া ওর বাড়িতেই যাই।

বিজয়া আর বনহুর জংলী মেয়েটার সঙ্গে এগিয়ে চললো।

পরবর্তী বই

জংলী মেয়ে